2000

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ১৯ তম সংখ্যা

১৫ এপ্রিল, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খাকদান জামাতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে বিশেষ অন্তরঙ্গ মূহুর্তে দুই বেয়াই জনাব ফজলুল করীম আকন্দ (বামে) ও জনাব আব্দুর রাজ্জাক মৃধা এবং অন্যান্য আহমদীবৃন্দ

পটুয়াখালী অঞ্চলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফর সঙ্গী সর্বজনাব মাহবুব হোসেন, ইব্রায়েতুল হাসান, সিরাজুল ইসলাম এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ও মোহাম্মদ সাদেক (দূর্গারামপুরী)কে দেখা যাচ্ছে

কাউনিয়ায় মাষ্টার ওহাব ও অন্যান্য সদস্যদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবকে দেখা যাচ্ছে

স্বাবলম্বী হওয়া ইসলামের শিক্ষা

পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের শক্তি সামর্থ্যের ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার নামই স্বাবলম্বন। দুনিয়াতে আত্মমর্যাদাশীল কোন ব্যক্তি বা জাতি স্বাবলম্বী না হয়ে পারে না। যারা পরমুখাপেক্ষী তারা ব্যক্তি-জীবনে এবং জাতীয় জীবনে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন তো দূরের কথা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসেও উৎকর্ষ ও বুৎপত্তি লাভে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম নয়।

আমরা ইলাহী জামাতের সদস্য, আমাদের ওপরে বিরাট দায়িত্ব। অথচ আমাদের সহায় সম্বল খুবই সীমিত। জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে এ জামাতের "বায়তুল মাল"। আর এটি এই জামাতের একক বৈশিষ্ট। এ জামাতের দায়িত্ব হলো সারা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ্‌র সঠিক ও একনিষ্ঠ বান্দাতে পরিণত করে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ জামাতের সদস্যগণ তাদের সামান্য সম্ভার নিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে প্রতি বছর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সুতরাং আমাদের জামাতের প্রতিটি পয়সা যে কত মূল্যবান তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সীমিত সম্পদ নিয়ে সমাজের এতীম, দুস্থ ও অসহায় লোকদের সাহায্য-সহায়তা করাও বায়তুল মালের একটি বড় কাজ। জামাত সাধ্যানুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "উপরের হাত (দাতা) নীচের হাতের (গ্রহীতা) চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" তাই আমাদের হাত পাতার অভ্যাসকে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মক্ষম আহমদীকে অবশ্যই স্বাবলম্বী হতে হবে। এক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) আর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য পথ-নির্দেশক। তাঁরা অভাবী ও দরিদ্র হয়েও জামাতের স্বার্থে সাধ্যানুযায়ী আর্থিক কুরবানী করেছেন। প্রাথমিক যুগে যারা দু' চার পয়সা আর্থিক কুরবানী করেছেন তাঁদের বংশধররা এখন আল্লাহ্‌র অসীম নিয়ামতে ভূষিত হয়ে লক্ষ-কোটি টাকার আর্থিক কুরবানী পেশ করে চলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানীর যে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা ঐশী জামাতে এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে যাচ্ছে। এর সাথে ইসলামী শিক্ষানুযায়ী পূর্ণ সততা ও সব ধরনের পরিশ্রমের অভ্যাস প্রদর্শন করতে হবে। হালাল উপার্জনের লক্ষ্যে ছোট থেকে ছোট কাজ করতেও যেন আমরা দ্বিধা না করি। আমাদের চেষ্টা হবে, আল্লাহ্‌র জামাতের উপর বোঝা না হ'য়ে আমরা যেন ঐশী জামাতের সাহায্যকারী হই।

সুতরাং আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে, নিজের ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে, দুনিয়ার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী বান্দা রূপে জীবন কাটানোর জন্যে আমাদের সবাইকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হতে হবে। এদিকে আমি জামাতের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ১৯তম সংখ্যা

২রা বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ৯ মহররম ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ শাহাদত ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ১৫ এপ্রিল ২০০০ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

হে মুসলিম জাহান যুগ-খলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ হও !

মহান আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদেরকে 'খয়রে উম্মত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যারা সারা দুনিয়ায় স্মরণীয় ও বরণীয় ছিল-এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। দুনিয়ার শিক্ষা-গুরু বলতে বুঝাতো মুসলমান মনীষীদেরকে। কিন্তু বিগত প্রায় হাজার বছর কাল ধরে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও স্বার্থগত কারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ায় এবং সর্বোপরি তাদের মধ্যে সত্যিকার ইমামত ও নেতৃত্ব না থাকায়, তারা আজ দুনিয়ায় একটি অবহেলিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো সর্বদা মুসলমানদের বিভক্তির সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন রঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে মুরব্বীয়ানা করার সুযোগ গ্রহণ করার কোন মওকাই হাত ছাড়া করে না। তারা আজও জানে মুসলিম শক্তিগুলোকে একতাবদ্ধ হতে দিলে তাদের মুরব্বীয়ানার দিন খতম হবে আর মুসলিম শক্তির মোকাবেলা করে কেউ তিষ্ঠিত পারবে না।

মুসলমানদের বিভক্তি এজন্যেই সম্ভব হয়েছে, কেননা মুসলমানদের মধ্যে কোন একক ইমামত বা নেতৃত্ব নেই। সম্প্রতিকালে মুসলিম জাহান এমনি সংকটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান যে, তারা যদি সঠিক পথে না এগোয় তাহলে তাদেরকে এমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে যার মাশুল তাদেরকে শতাব্দীকাল ধরে দিতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা যেহেতু মুসলমানদেরকে ভালবাসেন তাই যথা সময়ে তিনি তাঁর তরফ থেকে এক ইমামত ও নেতৃত্বের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও আপামর মুসলমান সে নেতৃত্বকে চিনতে সক্ষম হননি। এ জন্যে ইতোমধ্যে তাদেরকে বহু খেসারতও দিতে হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলার সে নেতৃত্ব থেকে আজও আহ্বান আসছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ৩-৮-৯০ তারিখে লন্ডনস্থ মসজিদে ফযলে জুমুআর খুতবায় সারা মুসলিম জাহানকে উদ্দেশ্য করে জলদগম্ভীর ভাষায় বলেছিলেন- "আল্লাহ্‌তাআলা যাকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে গ্রহণ করুন। তিনিই আপনাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখেন। তাঁকে ছাড়া তা থেকে পৃথক হয়ে আপনারা এমন একটি শরীরের মত যার মাথা নেই, দৃশ্যতঃ প্রাণ আছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছটফট করছে বরং ব্যথা ও বেদনার ঘোরে ছটফট সীমাতিরিক্ত। কিন্তু সেই মাথা অনুপস্থিত। শরীরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্যে তাকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ফিরে আসুন এবং খোদার প্রতিষ্ঠিত এই নেতৃত্বের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করুন। খোদার প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে স্বীকার করা ছাড়া আপনাদের জন্যে নিরাপত্তা এবং সফলতার অন্য কোনও পথ অবশিষ্ট নেই। সে জন্যে দুঃখের যুগ দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। ফিরে আসুন তওবা এবং ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-এর পথ অবলম্বন করুন। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, অবস্থা যতই খারাপ হয়ে থাকুক না কেন, যদি আপনারা আজকে খোদার প্রতিষ্ঠিত ইমামত ও নেতৃত্বের সম্মুখে আনুগত্য করেন, তাহলে শুধু পার্থিব দিক দিয়েই আপনারা সুবৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রকাশ পাবেন না বরং সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয়ের এমন মহান ব্যবস্থা সূচিত হবে যে, পৃথিবীর কোন শক্তি তার প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। যে ব্যাপার কয়েক শতাব্দী ধরে বিস্তৃত দেখাচ্ছে তা কয়েক দশকের ব্যাপার হবে, কয়েক বছরের ব্যাপার হবে। আপনারা অংশ গ্রহণ করুন বা না করুন। জামাতে আহমদীয়া দেহ মন বাজী রেখে এই পথে পূর্বে যেভাবে কুরবানী করে আসছে এখনও করতে থাকবে এবং কালও করতে থাকবে। চূড়ান্ত বিজয়ের গৌরব শুধু জামাতে আহ্‌মদীয়ার নামেই লিখা হবে। সুতরাং আসুন এবং এই বরকতময় ঐতিহাসিক পুণ্য কর্মে আপনারাও অংশ গ্রহণ করুন। খোদা আপনাদেরকে এর তৌফীক দান করুন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে আপনাদের সেবার তৌফীক দান করুন।

একজন উৎকৃষ্ট সেবক আপনাদেরকে দান করা হয়েছে, যে খোদার নামে তাঁরই খাতিরে এবং হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে সকল দুর্গম স্থানে আপনাদের জন্যে কুরবানী করার নিমিত্ত বসে ছিল; কিন্তু আপনারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হন নি এবং তাঁর সেবা হতে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। ইহা এই যুগের ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আল্লাহ্‌তালা তাদের সুবুদ্ধি দান করুন।

জামাতে আহমদীয়ার জন্যে আমার এই উপদেশ যে, তারা আপনাদের দ্বারা উপকৃত হোন বা না হোন, তারা আপনাদের নিজেদের ভাই মনে করুন বা না করুন আপনারা দোয়ার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সঃ)-এর সাহায্য করে যান এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষাকে কখনও ভুলবেন না যে, হে আমার হৃদয়! তুমি নিজের খাতিরে এই কথার খেয়াল রাখবে, শত হলেও এরা তোমার পয়গম্বরের ভালবাসার দাবী তো রাখে, হে আমার অন্তর! তুমি সদা এই ধ্যান রাখবে এবং সদা এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখবে যে, তোমার শত্রু অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যারা তোমার শত্রুতা করছে পরিশেষে তারা তো তোমার প্রিয় রসূল (সঃ)-এর প্রতি আরোপিত হওয়ারই দাবী করে। অতঃপর তোমরা ঐ রসূল (সঃ)-এর ভালবাসার খাতিরে সর্বদা এদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে থাকো। খোদাতাআলা আমাদেরকে উহার তৌফীক দান করুন" (ইসলামাবাদে, প্রদত্ত ২৩-৮-৯০ তারিখের জুমুআর খুতবা থেকে)।

বুদ্ধিমান লোক সময় বুঝে কাজ করে এবং সুফল লাভ করে। আজ মুসলিম জাহান যদি ঐশী খেলাফতের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর ইমামত ও নেতৃত্বে আস্থা ও আনুগত্য করে সামনে পদক্ষেপ রাখে তা হলে অবশ্যই মুসলিম জাহানের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে। ইহা আজও প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় অসাধ্য সাধনে সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে সুমতি দান করুন।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আন'আম	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ যুলুম নিষিদ্ধ	ঃ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ নিশানে আসমানী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৫
❑ জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ তবলীগ সম্পর্কে মর্মস্পর্শী সারগর্ভ উপদেশাবলী হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭-১৩
❑ আমি সাচ্চা মুসলমান	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ইলাহী	১৪
❑ স্মৃতিপটে বাংলার দক্ষিণাঞ্চল	ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৫-১৮
❑ ৭৬তম সালানা জলসায় ন্যাশনাল আমীর-এর ভাষণ	ঃ	১৯-২০
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১-২২
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৩-২৪
❑ রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন মূল ঃ জনাব মোহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর	ঃ অনুবাদ – জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া	২৫-২৬
❑ এম. টি. এ. ডাইজেষ্ট	ঃ সংকলন ঃ- জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	২৭-২৮
❑ সাইয়্যেদুল ইসতিগফার	ঃ সংগ্রহ - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২৮
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৯-৩০
❑ সংবাদ	ঃ	৩১

প্রচ্ছদ ঃ উপরে- খাকদানে আহমদীয়া মসজিদ, নীচে - কাউনিয়ায় আহমদীয়া মসজিদ

কাদিয়ানের জলসা সালানা-২০০০

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বর্তমান বছরেও রমযানের কারণে কাদিয়ানের ১০৯তম সালানা জলসার তারিখ ১৬-১৮ নভেম্বর; ২০০০ইং / ১৬-১৮ নবুওয়ত, ১৩৭৯ হিঃ শাঃ মোতাবেক রোজ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার মঞ্জুরী দিয়েছেন। জামাতের বন্ধুগণ এখন থেকেই নিয়্যত করুন আর দোয়া করতে থাকুন যেন এ কল্যাণময় জলসায় দারুল আমান কাদিয়ানের সালানা জলসায় যোগদান করে আধ্যাত্মিক ফলসমূহ কুড়োতে পারেন। (সাপ্তাহিক বদর, ২৩শে মার্চ, ২০০০ ঈসাব্দের সৌজন্যে)।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন

আরও যেসব জামাত ও সংগঠন ২৩শে মার্চ বা অন্যান্য তারিখে যথারীতি মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করেছে সেগুলো হলো ঃ

পটুয়াখালী, বগুড়া, কুমিল্লা, রাজশাহী, মাহিগঞ্জ, সুন্দরবন, কটিয়াদী, তেবাড়িয়া, পাগুলিয়া (মৌলবীবাজার), চান্দপুর চা বাগান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আহমদনগর, তারুয়া ও চট্টগ্রাম জামাত এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর ও লাজনা ইমাইল্লাহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

– আহমদী বার্তা

শুভ বিবাহ

গত ৩১/৩/২০০০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মোসাম্মৎ সৈয়দা জুলিয়ানা বেগম (স্বপ্না) পিতা মরহুম সৈয়্যদ সালেহ আহমদ, দক্ষিণ মৌড়াইল (মীর বাড়ী), জিলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সহিত জনাব নাসের আহম্মদ ভূঁইয়া, পিতা জনাব মুনীর আহমদ ভূঁইয়া, প্লট নং ১ ডি/১ই ব্লক ৩৪এ, মীরপুর, পল্লবী, ঢাকা বিবাহ টাকা ৩০,০০১/= দেন মোহরে দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী এবং দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এই বিবাহ বরকতমন্ডিত হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মুনীর আহমদ ভুঁইয়া

হিজরী ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

হিজরী ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠিক-পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ

জামাতের জন্য কয়েকজন নিরাপত্তা প্রহরী প্রয়োজন। ইচ্ছুক প্রার্থীকে সার্টিফিকেট ও জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্টের সুপারিশসহ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে। প্রাক্তণ সেনা সদস্যদের অগ্রাধিকার থাকবে।

– জেনারেল সেক্রেটারী

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম-৬

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্ন-এর মধ্য[৯০০] থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমরা প্রভু চাইতেন তাহলে তারা এটা করতো না। অতএব তুমি তাদেরকে বর্জন কর এবং তারা যা কিছু মিথ্যা রচনা করছে তা-ও।

১১৪। এবং (আল্লাহ্ এটা এ জন্যই চেয়েছেন) যেন পরকালের উপর যারা ঈমান আনে না তাদের অন্তর এর (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন এতে তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তারা যা অর্জন করছে তা অর্জন করতে থাকে।[৯০০-ক]

১১৫। (তুমি বল) তাহলে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করবো অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করেছেন ? এবং তারা, যাদেরকে আমরা কিতাব[৯০১] দিয়েছি জানে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্যসহ নাযেল করা হয়েছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে সত্যতার দিক দিয়েও এবং ন্যায়-বিচারের[৯০১-ক] দিক দিয়েও। (কারণ) তাঁর কথার[৯০২] পরিবর্তনকারী কেউ নেই; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তুমি যদি তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবে। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল মিথ্যে বলা ছাড়া কিছুই করে না।

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবগত যারা তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবগত যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।[৯০৩]

১১৯। অতএব, তোমরা তা থেকে আহার কর যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাক।[৯০৪]

১২০। এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তা থেকে আহার কর না, যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে ? অথচ তিনি তো তা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছেন যা তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন, কেবল তা ব্যতীত যাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে অজ্ঞতার দরুন নিজেদের ধারণার বশবর্তী হয়ে (লোকদেরকে) বিভ্রান্ত করে। তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং তার অভ্যন্তরীণ দিক উভয়ই বর্জন কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করেছে তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তারা সঞ্চিত করছে।

৯০০। "আল্ ইন্স" ও "আল্ জিন্ন" অর্থ- মানুষ এবং জিন্ন। শব্দদ্বয় কুরআনের বহু আয়াতে পাওয়া যায়, এতদ্দ্বারা আল্লাহ্তাআলার সৃষ্ট প্রাণীর দু'টি ভিন্ন প্রজাতি বুঝায় না, বরং মুনষ্যজাতির দু'টি শ্রেণীকে বুঝায়। "মানুষ" শব্দটি জনগণ বা সাধারণ লোক অর্থ ব্যক্ত করে এবং 'জিন্ন' শব্দ দ্বারা বড়লোক বুঝায়, যারা সাধারণ জনগণ থেকে দূরে থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করে না, বাস্তবে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে।

৯০০-ক। যাতে তারা তাদের অসৎ কর্মে লেগে থাকে। শব্দগুলির মর্মার্থ এ-ও হতে পারে যে, তারা যা অর্জন করে তার ফল ভোগ করতে থাকে।

৯০১। এই 'কিতাব' কুরআন শরীফের দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে; কারণ কেবল পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহই নয় বরং কুরআন নিজেও নবী করীম (সঃ)-এর সত্যতার দৃঢ় সত্যায়নকারী। ইহা এমন সব শিক্ষা বহন করে, যেগুলি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের বিপরীত হলেও পক্ষপাতশূন্য লোকের নিকট আবৃত্তি করলে এবং ব্যাখ্যা করে বুঝালে তারা সেগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৯০১-ক। বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করেছিলেন তখন তা ছিল প্রতিমায় ভর্তি, এবং তিনি একটার পর একটা মূর্তি তাঁর লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে চূরমার করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দগুলির আবৃত্তি করে কাফিরদের পতনের এই ঘটনার সঙ্গে আল্লাহ্তাআলা বাণী অবশ্যই পূর্ণ হয়েছিল (মনসুর)।

৯০২। ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বা পন্থা এবং পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র কানুন বা বিধান তাঁর প্রেরিত নবীদের সাহায্যার্থে কাজ করে থাকে।

৯০৩। ঈমানের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সত্য বা মিথ্যা তার বিচারকরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনও গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র আল্লাহ্তাআলাই অভ্রান্ত বিচারক। তিনি তাঁর বিচারের রায় বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন ঐশী-নিদর্শন প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং সত্য-সন্ধানীদের সাহায্য করার মাধ্যমেও।

৯০৪। আয়াত ২ঃ১৭৩ এবং ২৩ঃ৫২ ব্যক্ত করে যে, ভাল এবং বিশুদ্ধ পাক-পবিত্র খাদ্য গ্রহণের সরাসরি প্রভাব রয়েছে মানবের ক্রিয়াকর্মের উপরে। সুতরাং মু'মিনদেরকে এখানে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন স্বাস্থ্যকর বা হিতকর এবং বিশুদ্ধ এবং পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে যাতে তাদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং অন্তরের কলুষতা দূরীভূত হয়।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

যুলুম নিষিদ্ধ

❑ হযরত ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাঃ) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, বিদায় হজ্জ কি বা বিদায় হজ্জ কাকে বলে ? অতএব, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর মসীহে দ্দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠান নি, যিনি নিজের উম্মতকে দাজ্জালের ভয় দেখান নি। নূহ (আঃ) এবং তাঁর পরে আগত অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে এর ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করেছেন ! সে তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ব্যাপারটা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। এটাও তোমাদের অজানা নয় যে, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক এক চোখ বিশিষ্ট বা অন্ধ নন। দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে এবং তা আঙ্গুর ফলের মত ফোলা হবে। তোমরা সাবধান হও ! তোমাদের পরস্পরের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ এবং সম্মানের বস্তু, যেমন তোমাদের এ দিনটি সম্মানিত এবং তোমাদের এ মাসটি সম্মানিত। সাবধান ! আমি কি (খোদার বিধান তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি ? উপস্থিত সবাই বললেন, হ্যাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক। (তিনি পুনরায় বললেন) ঃ ধ্বংস হোক বা পরিতাপ! খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না (বুখারী)।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুলুম করল (অর্থাৎ জবর দখল করে নিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্) তার গলায় সাত হাসুলী জমিন পরিয়ে দিবেন (বুখারী, মুসলিম)।

❑ হযরত মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে (ইয়ামনের শাসক করে) পাঠানোর সময় বললেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল।" যদি তারা এ আহ্বান মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে ঃ প্রত্যেক দিন-রাতের সময়-সীমার মধ্যে আল্লাহ্ তাদের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে ঃ আল্লাহ তাদের জন্যে সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে বেছে বেছে তাদের উত্তম মালগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাক। আর মযলুম ও নির্যাতিতের দোয়াকে (অভিশাপকে) ভয় করা। কেননা, তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন আড়াল নেই (বুখারী, মুসলিম)।

❑ হযরত আবূ হুরাইরা (লাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ইজ্জতের ওপর অথবা অন্য কিছুর ওপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ পুণ্য তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের (নির্যাতিতের) পাপ থেকে (যুলুমের সমপরিমাণ) তার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে (বুখারী)।

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিষ পরিত্যাগ করে (বুখারী, মুসলিম)।

❑ হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে যুগ বা কাল তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবর্তন করছে। এক বছরে বার মাস, এর মধ্যে চারটি হ'ল নিষিদ্ধ মাস; এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জমাদিউস-সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি যিলহজ্জ মাস নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ শহর ? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচে' ভাল জানেন। এ উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি মক্কা শহর নয় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এটা কোন্ দিন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মান ও পবিত্র এবং সম্মানের বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সতর্ক হও ! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌঁছে দিবে তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি । আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক (বুখারী, মুসলিম)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হায় আফসোস ! লোক এই বিষয়ে কত যে গাফিল হয়ে আছে, অথচ মৃত্যু প্রত্যেকটি মানুষের পিছু লেগেই আছে। উপলব্ধি কর, কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় আগমন করা অর্থাৎ বাস্তবিক সশরীরে আসা খোদাতাআলা আদৌ ধার্য করেন নি। কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে দু'টি মৃত্যু এবং দু'টি প্রাণত্যাগের যন্ত্রণা দ্বারা কখনো কষ্ট দেওয়া যেতে পারে না। মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যে আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এই নিরর্থক বরং মারাত্মক ধারণার কারণে জগতে বড় বড় ভয়ানক ফিৎনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের কাছে মসীহ্‌কে খোদা বলে প্রমাণিত করার জন্য এই ধারণাটিই হলো ভিত্তিস্বরূপ। তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসের ফলে ধীরে ধীরে তাদের এই বিশ্বাস জন্মালো যে, এখন পিতা মহোদয় কিছু করেন না, সব কিছুই তার পুত্র স্নেহাস্পদকে, যে সদা জীবিত, সোপর্দ করে দিয়েছেন। মোট কথা মসীহ্‌র খোদা হওয়ার জন্য তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসটিই হলো খৃষ্টানদের প্রথম মৌলিক দলীল; যার সমর্থন আমাদের আলেমরা করছেন। কিন্তু সত্য কথা ইহাই যে, তিনি নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করেছেন। কুরআন করীম তার মৃত্যুর সেই সব স্পষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করছে যেগুলি অপরাপর মৃতগণের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বুখারীতে এসেছে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মত উচ্চ মর্যাদাশালী সাহাবী কুরআন শরীফের এই আয়াতে বর্ণিত 'তাওয়াফ্‌ফা'র অর্থ ঈসার এরূপ মৃত্যুর অর্থই বর্ণনা করেছেন। তিব্‌রানী এবং ইমাম হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আঃ) এক শত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। সেই হাদীসেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈসার বয়সের অর্ধেক আমার বয়স হবে। এখন বিষয়টি স্পষ্ট পরিষ্কার যে, যদি ঈসা মৃত্যু বরণ না করে থাকেন তাহলে মানতে হয় যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও এখন পর্যন্ত জীবিতই আছেন।

এস্থলে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ্‌র কালামের উপর গভীর চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায়, তাহলো এই যে, যখন মানুষ খোদাতাআলার ইচ্ছাক্রমে হেদায়াত লাভ করে দিনের পর দিন ক্রমাগতভাবে হক্ এবং সততার দিকে উন্নতি করতে থাকে, নিজ অস্তিত্ব ও আমিত্বকে বিলীন করে হীনকামনা বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলে, তখন তার আত্মশুদ্ধির ফলে সে এমন এক উচ্চ কেন্দ বিন্দুতে উপনীত হয় যে, সে সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির তিমিররাশি এবং হীন বাসনা-কামনার বাঁধন হতে নিষ্কৃত হয়ে দেহকে যা আসলে আত্মার আসনস্বরূপ, ভৌমিক ধূম্রজাল হতে মুক্ত করে স্বচ্ছ সলিল বিন্দুর ন্যায় হয়ে যায়, তখন সে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে কেবল একটি খালি ও মুক্ত আত্মাস্বরূপ হয় যা আত্মার প্রথম অবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে প্রভুর পূর্ণ আনুগত্যের ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলে। তখন সেই স্থানে উপনীত হলে পরে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে "রূহুল্লাহ্" ও "কলেমাতুল্লাহ্"– বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে ও অধিকার প্রাপ্ত হয়; এ অর্থ এক দিক দিয়ে এ হাদীস হতেও প্রতীয়মান হয় যা ইবনে মাজা ও হাকেম নিজেদের কিতাবগুলিতে বর্ণনা করেছেন যে, **লা মাহদী ইল্লা ঈসা** অর্থাৎ মাহ্‌দীর পূণ মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যে পূর্বে ঈসার রূপ ধারণ করে থাকে, অর্থাৎ যখন মানুষ সব কিছু বর্জন করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন পূর্ণতা অর্জন করে যে শুধু রূহই থেকে যায় তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে রূহুল্লাহ্ বলে অভিহিত হয় এবং আকাশে তার নামকরণ করা হয় ঈসা এবং খোদাতাআলার হাত দ্বারা তাকে এক আধ্যাত্মিক নব জীবন দান করা হয়, যা কোন দৈহিক পিতা দ্বারা নয় বরং খোদাতাআলার আশীষের ছায়া তাকে সেই নব জীবন দান করে।

সুতরাং ঈসা এবং দাজ্জালের বীজ ও মূলধারা সেই সময় হতেই আরম্ভ হয়েছে এবং কালক্রমে ক্রমবর্ধমানরূপে যে পরিমাণে দজ্জালীয়তের ফিৎনার অন্ধকার বৃদ্ধি পেতে থাকলো সেই পরিমাণেই খৃষ্টীয় মেযাজ ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্বও উহার মোকাবেলায় সৃষ্টি হতে লাগলো এমনকি আখিরী জমানায় যখন চরম দুষ্টাচার ও পাপাচার এবং অধর্মের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো, পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করলো এবং সেই সব গর্হিত মন্দ কর্ম যা পূর্বে এত ব্যাপক ও পর্যাপ্তভাবে কখনো প্রকাশ পায় নি বরং নবী করীম (সঃ) কেবল শেষ জমানায়ই এইসব বিস্তার লাভ করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। দজ্জালী ফিৎনা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেল। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাবশ্যক ছিল যেন পূর্ণরূপে খৃষ্টীয় মেযাজ ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। স্মরণ রাখা উচিত যে, নবী করীম (সঃ) শেষ জমানায় যে সকল গর্হিত মন্দ কর্ম বিস্তার লাভ করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঐগুলির সমষ্টির নামই দজ্জালিয়ত; যার জালসমূহ বা এইরূপও বলা যেতে পারে যে, যার শাখা-প্রশাখা সহস্র সহস্র প্রকারের হবে বলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যেমন ঐগুলির মধ্যে ঐ সকল মৌলবী ও দজ্জালীয়তের বৃক্ষের শাখা বিশেষ যারা গোঁড়ামী অবলম্বন করেছে এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা কুরআন করীম পাঠ করে অবশ্য কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামে না। মোট কথা, দাজ্জালীয়ত এযুগে মাকড়সার ন্যায় জাল বিস্তার করছে। কাফির তার কুফরী দ্বারা, কপট তার কপটতা দ্বারা, মদ্যপায়ী মদ্যপান দ্বারা এবং মৌলবী তার আমল বিহীন কথা এবং হীন ও কালো মনোবৃত্তি দ্বারা দাজ্জালীয়তের জাল বুনছে; এসব তার এখন কেহ কর্তন করতে পারবে না কেবল সেই অস্ত্র ছাড়া যা আকাশ থেকে নেমেছে। এবং অস্ত্রকে কেউ চালাতে পারবে না কেবল সেই ঈসা ছাড়া, যে আকাশ থেকে অবতীণ হয়েছে। শুনে রাখো যে, ঈসা অবতীর্ণ হয়ে গেছে ঃ

"আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল যা পূর্ণ হয়েছে"।

(নিশানে আসমানী পুস্তকের ৪র্থ কিস্তি)

অনুবাদ - **আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক**, সদর মুরব্বী

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা

৪০ হিজরীর পবিত্র ১০ তারিখে শহীদদের নেতা আলাহেস্ সালাম সত্যের সমর্থনে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। তিনি (জামাতের আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা-অনুবাদক) (আঃ) বলেন ঃ 'কারাবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যদের পক্ষ থেকে মুস্তাফা (সঃ)-এর পরিবারবর্গের ওপরে যে নির্যাতন চালানো হয় উহা প্রত্যেক সহানুভূতিশীল মুসলমানের প্রাণে রক্তক্ষরণ করে। এ ঘটনা হযরত ইমাম হুসায়েন আলায়হেস্ সালামের দীপ্তিমান মকাম ও মর্যাদা সর্বকালের জন্যে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম বলেন যে, আমি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বীয় জামাতকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা দৃঢ়-বিশ্বাস রাখি যে, ইয়াযীদ একটি অপবিত্র স্বভাববিশিষ্ট মাটির পোকা এবং অত্যাচারী। আর যে অর্থ ও উদ্দেশ্যে কাউকে মু'মিন বলা হয় ঐ সব তার মধ্যে মজুদ ছিলো না। মু'মিন হওয়া কোন সহজ বিষয় নয়। আল্লাহ্তাআলা এসব লোকদের সম্বন্ধে বলেন- ক্বলাতিল আ'রাব আমান্না ক্বুল লাম তু'মিনূ ওয়া লাকিন ক্বুলু আসলামনা। (মরু-বাসী আরবরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলে দাও, তোমরা ঈমান আনো নি বরং বলো, আমরা মুসলমান হয়েছি)। ঐ সকল লোক মু'মিন হয়ে থাকে যাদের কর্ম তাদের ঈমানের সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। তাদের প্রাণে ঈমান লেখা হয় যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব কিছুর ওপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তাকওয়া ও খোদা-ভীতির সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ পথসমূহকে খোদার জন্যে অবলম্বন করে আর তাঁর ভালবাসায় নিমগ্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি বস্তু যা মূর্তির ন্যায় খোদার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়- হোক না তা চারিত্রিক অবস্থা বা দুষ্কৃতিপূর্ণ কর্ম অথবা অমনোযোগিতা ও আলস্য যা নিজ সত্তাকে সবচে' দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইয়াযীদের যে, এসব বিষয় তার মধ্যে ছিলোই না। পৃথিবীর আকর্ষণ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) পবিত্র ও পবিত্রকৃত ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে ঐ মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদের খোদাতাআলা স্বহস্তে পরিবর্তন করেন এবং নিঃসন্দেহে পর জগতে বেহেশ্তের অধিকারী করেন এবং তাঁর ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমানের ক্ষতির কারণ হবে। এই ইমাম খোদা-ভীরুতা, ভালবাসা, ধৈর্য ও স্থৈর্য, সাধনা ও ইবাদতে আমাদের জন্যে উচ্চ আদর্শস্বরূপ এবং আমরা এই নিষ্পাপ সত্তার হেদায়াতের অনুসরণকারী যা কিনা তিনি লাভ করেছিলেন। যে তাঁর শত্রু তার অন্তর বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে ঐ প্রাণ যা কর্মের আকারে তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে এবং তার ঈমান, চরিত্র, বীরত্ব, খোদা-ভীরুতা, ধৈর্য-স্থৈর্য, এবং ঐশী ভালবাসার সর্বপ্রকার নক্শা ছাপ হিসেবে পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে, যেভাবে একটি স্বচ্ছ দর্পণে একজন খুব সুন্দর মানুষের নক্শা থাকে। এসব লোক দুনিয়ার দৃষ্টির অগোচরে থাকেন। কে তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত ? কেবল সে-ই জানে, যে তাঁর অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর দৃষ্টি তাকে সনাক্ত করতে পারে না। কেননা, তিনি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদত এ কারণেই হয়েছিল। কেননা, তাঁকে সনাক্ত করা হয় নি। দুনিয়া কোন্ পবিত্র ও মনোনীত সত্তাকে তাঁর জীবদ্দশায় ভালবেসেছে যে, হুসায়েন (রাঃ)-কেও ভালবাসবে ? মোট কথা এ বিষয় খুবই নিম্নমানের পাপিষ্ঠতা ও বেঈমানীর অন্তর্ভুক্ত যে, হুসায়েন (রাঃ)-কে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। আর যে ব্যক্তি হুসায়েন (রাঃ) বা অন্য কোন বুযর্গ ব্যক্তির, যে উম্মতের পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভুক্ত, হেয় দৃষ্টিতে দেখে বা কোন নিন্দাপূর্ণ বাক্য তাঁর প্রসঙ্গে নিজের জিহ্বায় আনে সে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে। কেননা, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ্ তার শত্রুতে পরিণত হয়, যে তাঁর বুযর্গ ও প্রিয় বান্দাদের শত্রু (ফতওয়া মসীহে মাওউদ, ফুরকান পত্রিকা, জুলাই ১৯৫৮ এর বরাতে)।

বর্তমান কালে যে রঙ্গে এ বেদনাদায়ক স্মৃতিকে স্মরণ করা হয়ে থাকে আহাদীস ও কুরাআনী শিক্ষা থেকে ইহা বহু দূরে। মাজমাউল বাহরাইনে আদেশানুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময়ে ইন্নালিল্লাহ্ ... বলা হয়।

যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ আছে যেন, সঠিকভাবে শোক প্রকাশ করার সময় ধৈর্য ও স্বস্তিকে সমুন্নত রাখা হয় এবং এর সঠিক পদ্ধতি হলো এই যে, সর্বপ্রকার কান্না-কাটি, বুক-চাপড়ানো, বিলাপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ তাই আর কোন্ ব্যক্তি আছে যাঁর জন্যে এসব কর্মকান্ড বৈধ হবে ? আর হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যু দুনিয়ার সকল দুর্ঘটনা থেকে বড় দুর্ঘটনা বলে গণ্য, যেমন কিনা এর উল্লেখ হায়াতুল কুলুবের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় আছে।

হুযূর (সঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ

তিনি (সঃ) ওসীয়্যতের আকারে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ "হে ফাতিমা ! যখন আমার মৃত্যু হবে তখন আমার জন্যে মুখমন্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করবে না। চুলকে উশ্কো-খুশ্কো করবে না। বিলাপ করবে না। আমার জন্যে বুক চাপড়াবে না এবং বুক চাপড়ানো লোকদের ডাকবে না (হায়াতুল কুলুব-এর উদ্ধৃতি, শিয়াদের পুস্তক থেকে)।

হযরত হামযা (রাঃ)-কে যে নিষ্ঠুর ও বিভৎস পন্থায় শহীদ করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের পাতার উজ্জ্বল ঘটনা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ সময়ে কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ? লেখা আছে- "এ ঘটনায় হুযূর (সঃ) বিলাপ করেন নি, হা হুতাশ করেন নি। কান্না-কাটিতেও প্রবৃত্ত হন নি" (হায়াতুল কুলুব, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬)।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সঃ) মৃত্যুর পরে সর্বপ্রকার বিলাপ ও মাতম করাকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আজ শিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে এসব বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করা দরকার যে, তারা নিজেদের প্রিয় নবী (সঃ)-ও বুযর্গদের আদেশ কতটা পালন করছেন।

আজতো সুন্নী মুসলমানও তাযীয়া তৈরী করে উহাকে খুবই সজ্জিত করে প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। এমন অনৈসলামিক কার্যক্রম দৃষ্টিতে চলে আসে যে, একজন প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। সুতরাং দোয়া করি যে, আল্লাহ্তাআলা সকলকে প্রকৃত ইসলাম শিখার সৌভাগ্য দান করেন এবং শিরক্ ও বি'দাত থেকে রক্ষা করেন, আমীন।

(সাপ্তাহিক বদর, ১৫-২২ মে, ১৯৯৭ এর সৌজন্যে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

জুমুআর খুতবা

তবলীগ প্রসঙ্গে মর্মস্পর্শী সারগর্ভ উপদেশাবলী

"আমরা তো সে প্রদীপ নিয়েই সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছি যে প্রদীপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের হাতে ধরিয়েছিলেন।"

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৪ জানুয়ারী, ২০০০ইং লন্ডনে মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরাতু হাম্-মীম আস সিজদার ৩৪-৩৬তম আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٦﴾

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি' অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহ্র দিকে লোকদের আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত'? ভাল এবং মন্দ উভয় উভয়ের সমান হতে পারে না। তুমি যা সর্বোত্তম তার দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ কর, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে (তোমার) সাহায্যকারী এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। তবে এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরই যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই মর্যাদার অধিকারী করা হয় কেবল মহা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকেই।"

এ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করাতে এ তো প্রকাশ পেয়ে থাকবে যে, আমি এই খুতবায় তবলীগের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। রমযানের দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং রমযান বহুবিধ পুণ্য রেখে গেছে কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এখন তোমরা বেরিয়ে পড় এবং জেহাদের ময়দানে অর্থাৎ রূহানী জেহাদে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ কর। যখন ই'তিকাফের দিনগুলোও পেরিয়ে গেছে তখন আর বসে থাকার সময় নেই, বরং এখন বাইরে বেরুবার সময়। **বস্তুতঃ এ বছর জামাতের যে কর্মসূচী রয়েছে** তা অনেক বড়, অনেক বিশাল ও মহান। **এবং আল্লাহ্র নিকট আমি আশা রাখি যে, বিগত বছরের চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যায় আহমদী হবে এ বছরটিতে।** অতএব, এই প্রত্যাশায় আমি খুতবার এ বিষয়-বস্তুটি বেছে নিয়েছি যেন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছরের (টার্গেট পূরণের) জন্য এখন দ্রুতবেগে এগিয়ে যান এবং প্রত্যেক সে ময়দানকে জয় করুন যার সাফল্য-ফলক আল্লাহ্তাআলা আপনাদের নামে লিখে রেখেছেন। এগুলো এরূপ মহামর্যাদাপূর্ণ ঘটনা যা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি পূর্বে কখনও দৃশ্যমান হয় নি– না খ্রীষ্টান ধর্মে এবং না অন্য কোনও ধর্মে। কখনও এক বছরে প্রায় এক কোটি লোকের দীক্ষাগ্রহণের সাফল্যলাভ আর কারও ভাগ্যে জুটে নি এবং

আগামী বছর আবার তার চে' দ্বিগুণের প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছি। এটা এরূপ বিষয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলার বিশেষ ফযল (কৃপা) বর্ষিত না হয় তা পূরণ হতেই পারে না। বান্দার সাধ্যের ব্যাপার নয়। সেজন্যে আমি আজ খুতবার এ বিষয়টিই নির্বাচন করেছি যে, আগে বাড়ুন এবং বীরত্বের সঙ্গে এই সংগ্রামের সমস্ত এরূপ ক্ষেত্র জয় করুন যা আপনাদের তকদীরে প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই। 'বুখারী-কিতাবুত তফসীরে" আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) "ইদ্‌ফা বিল্লাতি হিয়া আহ্সান"-(যা সর্বোত্তম উপায় তদ্বারা প্রতিরোধ কর) এ আয়াতাংশের তফসীর বর্ণনা করেছেন, "তা হচ্ছে ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং দুঃখ-কষ্ট পেয়ে ক্ষমা করা। অতএব যখন মানুষেরা তদ্রূপ করবে তখন আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে হিফাযত করবেন এবং তাদের শত্রুদেরকে তাদের সামনে নত করে দিবেন।" এই তফসীর আঁ হযরত (সঃ) কর্তৃক বর্ণিত এবং অত্যন্ত গভীর (তত্ত্বপূর্ণ) তফসীর। যখন মানুষ তবলীগের ক্ষেত্রে বের হয় তখন সেখানে তাকে ক্রোধাত্মক ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বহু ধরনের বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় – মানুষেরা অনেক গালি-গালাজ করে, কটুকথা বলে এবং চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারও করে থাকে। সে ক্ষেত্রে দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্-এর অবশ্য কর্তব্য তারা যেন ধৈর্য ধারণ করেন, ঐ সব কিছুকেই মৃদু মৃদু হেসে উড়িয়ে দেন, অথবা বদ-দোয়া শুনে দোয়া দিতে শুরু করেন– এ বিষয়গুলোই হচ্ছে সে উপায় যা মহা পরিবর্তনসমূহের সৃষ্টি করে থাকে। সমগ্র জগদ্ব্যাপী আহ্মদীদেরকে যারা– এখন তবলীগের ময়দানে বেরুবেন- এখন রমযানের পরে আগামী বছরের প্রস্তুতিসমূহ আরম্ভ হয়ে গেছে, এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রত্যেক কদম আগে বাড়াতে হবে, সে দিক থেকে **আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, ধৈর্যধারণ একান্ত আবশ্যকীয়।**

দুঃখ পেয়ে ক্ষমা করে দেয়া এক কথা, আর গালি শুনে ধৈর্য ধরা ভিন্ন কথা। কেউ যেমন কষ্ট দিল- মেরে বসলো, থাপ্পর মেরে দিল- খোদার পথে তখন বরদাস্ত করা, সয়ে নেয়া এবং রাগ দমন করে সংযত থাকা-এ সেই দু'টি বিষয় যা আঁ হযরত (সঃ) তাগিদপূর্বক বর্ণনা করছেন, "তদনুযায়ী তারা যদি কাজ করে তাহলে আল্লাহ্তাআলা তাদের হিফাযত করবেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শও তা-ই ছিল এবং তদনুযায়ী-ই আল্লাহ্তাআলা তাঁর সাথে আচরণ করেন।

'বুখারী, কিতাবুত্-তফসীর' থেকে আরেকটি হাদীস ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা

করেন, "যখন আল্লাহ্তাআলা "ওয়া আন্যির আশীরাতাকাল আকরাবীন" (অর্থাৎ তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক কর)- আয়াতটি নাযেল করেন, তখন আঁ হযরত (সঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে কুরাইশ গোত্র ! (আল্লাহ্র পথে) নিজেদের প্রাণের সওদা কর। আমি আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবো না। হে বনী আব্দে মুনাফ ! আমি আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ! আমি আল্লাহ্র মোকাবেলায় আপনার কোন কাজে আসতে পারি না। হে আল্লাহ্র রসূলের চাচী সাফীয়া ! আমি আল্লাহ্র মোকাবেলায় আপনার কোন কাজে আসতে পারি না। হে ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদ (সঃ)! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। তথাপি আমি আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমার কোন কাজে আসতে পারবো না।"

এখানে বিষয়টি সতর্কীকরণ সম্পৃক্ত এবং এ হাদীসটি আমি এজন্য বেছে নিয়েছি যে, বহু এরূপ আহমদী আছেন যাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা অ-আহমদী। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহুবার আগেও 'তাহ্রীক" (আহ্বান) করা হয়েছে- মানুষ নারাজ হয়ে দূরে সরে না যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ (উক্ত আহমদীরা) সাধারণতঃ আত্মীয়দের তবলীগ করতে ঘাবড়ায়। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর এই রীতি ছিল না। তিনি তো কারও বিচলিত হবার বা কারও নারাজ হয়ে যাবার সম্বন্ধে পরোয়া করেন নি, বরং নিজের প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়-স্বজনকে নির্ভয়ে-নিঃসংকোচে তবলীগ করেছেন। তদ্রূপ তিনি যদি না করতেন তাহলে তবলীগের যে ফরয দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল তা সুসম্পন্নই হতো না। অতএব, (তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণে) আপনারাও নিজেদের এই দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন এবং তা এগিয়ে নিয়ে চলুন- নিজেদের প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়-স্বজনদেরকে নির্দ্বিধায় তবলীগ করুন। আল্লাহতাআলা অবশেষে কখনও তো তাদের মন ফিরিয়ে দিবেন, ফলে তারা এদিকে ঝুঁকবে। পাকিস্তানে তো পরিস্থিতি অন্য রকম, কিন্তু আফ্রিকায় আল্লাহ্তাআলার ফযলে এর (দরুন) অনেক উপকার সাধিত হচ্ছে। মানুষ (আহমদীরা) তাদের প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে তবলীগ করছেন তারা আবার নিজেদের নিকটাত্মীয়দের ও প্রিয়জনদেরকে তবলীগ করেন। এমনি ধারায় তাদের যে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বছর দ্বিগুণ হবার প্রক্রিয়া তা জারী থাকে।

একটি হাদীস মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল থেকে গৃহীত। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'পুণ্যের কথা যে ব্যক্তি অপরাপরকে জানায় সে তা পালনকারীর মতই হয়ে থাকে'। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন করীমের আয়াত যা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়েছে তাতে একথা আছে যে, মানুষ প্রথমে নিজে তা পালন করে যা সে অন্যকে বলে। অতএব, হাদীসটির অর্থ হচ্ছে, যে অন্যকে বলে সে প্রথমে আমল করে তারপর বলে। এরূপে যে অন্যকে পুণ্যের কথা বলে সে তা পালনকারীর মতই হয়ে থাকে। অতএব এ হাদীসটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, হাদীসগুলোতে যদি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে দেখবেন সেগুলোর সত্যতা স্বয়ং নিজের ভাষায় কথা বলে। হযরত ইমাম হাম্বলের মুসনাদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে, কিন্তু কুরআন করীমের মোকাবেলায় এর কোন মর্যাদা বা মূল্য নেই। কুরআন করীম স্পষ্টতঃ বলেছে' "তার চেয়ে কথায় অধিক উত্তম কে হতে পারে, যে আগে সৎকর্ম করে তারপর পুণ্যের দিকে আহ্বান করে ?" অতএব, **এবিষয়টি ভুলে যাবেন না যে, আপনাদেরকে প্রথমে আমল করতে হবে, তারপর পুণ্যের দিকে আহ্বান করতে হবে।**

মুসলিম কিতাবুল-ইলম্-এ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস লিপিবদ্ধ আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ এবং হেদায়াতের প্রতি (মানুষকে) আহ্বান করে সে ঐ পরিমাণে সওয়াব (পুরস্কার) লাভ করে যে-পরিমাণ সওয়াব তা পালনকারী লাভ করে থাকে এবং তাদের সওয়াবে কোনকিছু কম হয় না। তেমনি, যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ ও পথভ্রষ্টতার দিকে (অন্যকে) আহ্বান করে সে-ও সেই পরিমাণ গোনাহ্র ভাগি হয়, যে পরিমাণ গোনাহ্র ভাগি হয়ে থাকে তা পালনকারী, এবং তাদের গোনাহ্র মাত্রায় কোন তারতম্য ঘটে না" (মুসলিম, কিতাবুল-ইল্ম, বাবু মান সান্না হাসানাতান আও সাইয়্যেয়াতান)।

এই হাদীসটি বিশেষভাবে এজন্যে নির্বাচন করেছি যে, আপনারা সৎকর্ম পালন করার পর যখন সৎকর্মের দিকে আহ্বান করবেন তখন যতজন লোক-ই আপনাদের হেদায়াত দানের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে হেদায়াত লাভ করতে থাকবে তাদের সকলের পুণ্য আপনাদের নামে লিখা হবে। তারপর নেক আমলের মাধ্যমে যাদেরকে তারা তবলীগ করবে তাদের পুণ্যও আপনাদের নামেই লিখা হবে। ইহা অফুরন্ত পুণ্য বৃদ্ধির এক অপরিসীম ধারা, যার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন দায়ী-ইলাল্লাহ্গণ। অতএব, এ কাজটিকে (তবলীগকে) মামুলি (কাজ বলে) মনে করবেন না। অতএব, **এপথে যথাসাধ্য নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করুন- আল্লাহ্তাআলা আপনাদের হিফাযত করবেন। তেমনি আপনারা নিজেদের প্রিয়জন এবং নিকটাত্মীয়দেরকেও ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্ক করুন এবং অপরাপরকেও করুন, কিন্তু এই নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে করুন যে, তারা যেন সুসংবাদসমূহের ভাগি হয়।** ভীতিপ্রদর্শনের একটি উদ্দেশ্য তো হয় ভয় ধরিয়ে দেওয়া কিন্তু আরেক উদ্দেশ্য হচ্ছে ভুল পথ থেকে রক্ষা করার জন্যে, সুসংবাদদানের লক্ষ্যে ভীতিপ্রদর্শন। (এই ধারায়) তাদেরকে আপনারা ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্ক করুন। মনে রাখবেন, আঁ হযরত (সঃ)-ও এ আঙ্গিকেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। এর প্রতিদান অনেক বড় এজন্যে যে, **(তবলীগের ফলে) মানুষেরা যদি খারাপ কাজ ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিবৃত্ত হয় এবং সৎকর্ম করে তাহলে আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে দায়ী-ইলাল্লাহ্গণ এর প্রতিদান সবসময় পেতে থাকবেন।**

সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, "খোদার কসম, তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তির হেদায়াত পেয়ে যাওয়া তোমার পক্ষে উত্তম শ্রেণীর লোহিতবর্ণের উট পেয়ে যাওয়ার চেয়েও শ্রেয়" (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল বাবু ফাযায়েলে আলীয়ে-বনে তালিব)। আরবদের মধ্যে লাল রং-এর উটের অনেক মূল্য ধরা হতো, সেগুলোর কদর ছিল বেশী। হযরত আলী, যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের হেদায়াত লাভের কারণ হয়েছিলেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, যদি তুমি একজনেরও হেদায়াত লাভের কারণ হতে পার তাহলে অসংখ্য উটের অধিকারী হওয়ার চে' তোমার মর্যাদা শ্রেয়। অতএব, এর তুলনায় সে উটগুলোর প্রকৃতপক্ষে কোনও মূল্য নেই। যে প্রতিদান আল্লাহ্ দান করে থাকেন তা কারও হেদায়াত লাভের কারণ হবার যে প্রতিদান, তা বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে।

'মসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল'-এ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'লোকদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাবে, তাদের জন্যে কাঠিন্য সৃষ্টি করবে না। সুসংবাদ দাও, তাদেরকে নিরাশ ও হতাশ করে দিও না।' **তবলীগের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ দেখানোর বিষয়টিও অনেক তাৎপর্য রাখে। তাদেরকে এমনভাবে আহ্বান করা উচিত নয় যে, তাতে আহমদীয়তের পথে পরিচালিত হওয়া অর্থাৎ সৎকাজগুলো পালন করা তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়। বরং প্রীতি ও নম্রতার সাথে ঐ পথগুলোকে সহজ করে দেখানো উচিত। যখন আপনারা পুণ্যের পথসমূহকে সহজ-সরল করে দেখাবেন এবং এ প্রসঙ্গে নিজের দৃষ্টান্তগুলো পেশ করবেন এই বলে যে, 'আমরাও তো এই পথে আগুয়ান হয়েছি, দেখুন! আল্লাহ্‌তাআলা তাতে যে কতো কৃপা করেছেন। এ-ই হচ্ছে সহজ-সরলভাবে সৎপথের দিকে আহ্বান। অতএব, আমি আশা রাখি যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর এই মহান উপদেশটিও জামাত সব সময় স্মরণ রাখবে।** (সতর্ককরণের পাশাপাশি) সুসংবাদ দিন, তাদেরকে বলুন, 'আল্লাহ্‌তাআলার অনেক অনেক বরকত ও আশীষ আপনাদের ওপর অবতীর্ণ হবে।' তাদেরকে কখনও হতাশ হতে দিবেন না।

'তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতানায়' এ হাদীসটি হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর ক্ষমতার মুঠোয় আবদ্ধ রয়েছে আমার প্রাণ, হয়তো তোমরা পুণ্যের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে নয়তো অচিরেই আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে কঠোর আযাবে লিপ্ত করবেন, তখন তোমরা দোয়া করেও কুল পাবে না, তোমাদের দোয়া গৃহীত হবে না"। অতএব, নেকী ও সৎপথের দিকে আহ্বান করা এবং পাপ ও খারাপিগুলো থেকে বারণ করা মুসলিম উম্মাহ্‌র রীতি ও স্বভাবস্বরূপ হওয়া উচিত। ইহা এমনই রীতি-নীতি যে, তা যদি পালন না করা হয় তাহলে সব সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি বেশামাল হয়ে পড়বে। তখন অসময়ের পুণ্য বা হাহুতাশ কোন কাজে আসবে না।

'পুণ্যের দিকে আহ্বান' সম্পর্কে উলামার ধারণা- অর্থাৎ ঐসব জাহিল উলামার, যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র হাদীসাবলীর সঠিক মর্ম কিছুতেই বুঝে ওঠতে পারেন না তারা মনে করেন যে, জবরদস্তি লাঠির জোরে পুণ্যের দিকে ডাকো, সৎকাজের আহ্বানের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কর। অথচ তাদের এই ধারণা নিছক অজ্ঞতা। কুরআন করীম তো এটাকে অস্বীকার করে। লাঠির জোরে, বলপ্রয়োগে পুণ্য কখনও অন্তরে প্রবেশ লাভ করতেই পারে না। অসম্ভব। সূরা হুদ তিলাওয়াত করুন, সেখানে এ বিষয়-বস্তুই বার বার বর্ণিত হয়েছে। বারংবার সদুপদেশের মাধ্যমে পুণ্যগুলোকে মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হও। যদি ওরূপ না কর এবং এই ধারায় জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে তোমরা কোন অংশগ্রহণ না কর তাহলে পরিশেষে কঠোর আযাবের শিকার হয়ে পড়বে, তারপর তখন তোমাদের দোয়া তোমাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত আবূ ওয়ায়েল (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি 'মুসলিম, কিতাবু সিফাতিলকিয়ামাহ্'-তে লিপিবদ্ধ যে, হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের মাঝে ওয়ায (উপদেশমূলক বক্তৃতা) করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, 'আমি চাই আপনি যেন প্রত্যেক দিন ওয়াজ করেন।' ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আমি চাই না তোমাদের বিরক্তির কারণ হতে। সেজন্যে বিরতি দিয়ে "আমি তোমাদের মাঝে ওয়ায করে থাকি, যেমন কিনা আঁ হযরত (সঃ) বিরতি দিয়ে দিয়ে ওয়ায করতেন এই ভেবে যে, আমরা যেন বিরক্ত-বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ি।"

তবলীগের ক্ষেত্রে এ নীতিটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। আপনারা যদি কোন এক জনের পিছনে এভাবে লেগে যান যে, স্থান-কাল ও সময়-সুযোগ দেখে কথা বলার তওয়াক্কা না করেন, প্রত্যেক দিন একই বাঁশি বাজাতে থাকেন তাহলে সে বিরক্ত হয়ে দূরে সরে যাবে। আপনার বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে না। **সেজন্য স্থান-কাল ও সময়-সুযোগ বুঝে তবলীগ করা--এটা দায়ী ইলাল্লাহ্‌র কাজ। সেজন্য কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা দায়ী-ইলাল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে হিকমত ও প্রজ্ঞার শর্ত বেধে দিয়েছেন। যে কথাই বল তা হিকমতের সঙ্গে বুঝে-সুজে বল। উদ্দেশ্য হচ্ছে শিকার যেন হাতে এসে যায়। এর জন্যও অসংখ্যভাবে কৌশল খাটাতে হয়। শিকারীরা জানেন শিকারকে ফাঁসাবার জন্য তারা যে কত রকম কায়েদা-কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। অবশ্য ঐ শিকার তো এজন্যে ফাসানো হয় যে, তা ধরে বধ করে দেয়া হয়। আপনারা তো ঐ শিকার করছেন যাকে জীবিত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। অতএব, এই শিকারের ক্ষেত্রে অনেক হিকমত খাটাবেন এবং সবসময় সেভাবে কথা বলবেন যাতে করে তা অপর ব্যক্তির অন্তরকে স্পর্শ করে, সেখানে স্থিতি লাভ করে।**

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করছি। প্রাতঃকালীন ভ্রমণ থেকে ফিরার সময় হযরত আকদস (আঃ) নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, "আমি প্রায়শঃ শুনে থাকি যে, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে সময়-সময় তবলীগ করতে থাকেন।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত নওয়াব সাহেবেরও এই রীতি ছিল যে, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তবলীগ করতে থাকতেন। অথচ তারা ছিলেন কট্টর শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। তাদের মাঝে তবলীগ করা কোন সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করণের যে আদেশ এসেছে হযরত নওয়াব সাহেব তা অত্যন্ত সাহস ও যত্ন সহকারে পালন করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ইহা অতি উত্তম কথা। সবসময় মানুষের চিন্তা করা উচিত, যথাসম্ভব উপায়ে (পরিবার ও জ্ঞাতিগোষ্ঠির) মহিলা ও পুরুষ সকলকে যেন এ বিষয়টি (আহমদীয়ত সম্পর্কে) জানিয়ে দেয়। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে কোন গোত্রের প্রধান আল্লাহ্ কর্তৃক সেভাবেই জিজ্ঞাসিত হবে যেভাবে কোন জাতির নবী (জিজ্ঞাসিত হবেন)। মোটকথা যে-সুযোগই পাওয়া যায় তা হারানো উচিত নয়। জীবনের কোন ভরসা নেই। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে যখন 'ওয়া আন্‌যির আশীরাতাকাল আক্‌রাবীন' (তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর) এ আদেশ দেয়া হলো তখন তিনি নাম ধরে ধরে তাদের সকলকে খোদার বাণী পৌঁছে দেন। তেমনি আমি কয়েকবারই মহিলা ও পুরুষ সকলকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তবলীগ করেছি।' এবং এখনও কোন কোন সময় বাড়ীতে ওয়ায শুনিয়ে থাকি। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, মহিলাদের জন্য একটি গল্পাকারে প্রশ্নোত্তরে (শরীয়তের) যাবতীয় মসলা সরল ভাষায় বর্ণনা করা হোক। কিন্তু আমার পক্ষে তেমন একটা অবকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কোন মহোদয় যদি তা প্রণয়ন করেন তাহলে মহিলারা উপকৃত হবে" (মলফুযাত ১ম খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৫৮৪)।

এখন হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ নসীহতটি পালন করার কিছুটা এই অধমেরও সুযোগ ঘটেছে। বহুল মাত্রায় মহিলাদেরকে আমি সুযোগ দিয়ে থাকি, তাদের মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়, তা যেন তাঁরা নিঃসংকোচে পেশ করতে পারেন। এর ফলে মাসায়েল সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হতে থাকেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর এই রীতি ছিল যে, মহিলাদেরকে তিনি সুযোগ দিতেন নিঃসংকোচে তাঁরা যেন বক্তব্য রাখতে পারেন। প্রকাশ্য মজলিসেও তাঁরা তাদের ঘরোয়া কথাও উপস্থাপন করতেন, তবে তা এরূপ কথা-ই হতো যার দ্বারা শরীয়তের ওপর আলোকপাত হয়। সুতরাং শরীয়তের বিষয়ে আঁ হযরত (সঃ) কখনও তাঁদেরকে অসঙ্গত লজ্জাশীলতাবলম্বনের জন্য তাগিদ করেন নি। বরং সর্বদা বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা কথা বলতেন। আমাদের যুগেও মহিলারা আল্লাহ্তাআলার ফযলে এ প্রসঙ্গে শরীয়তের বিষয়ে এই স্বভাবগত দ্বিধা-সংকোচকে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং যা জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকে তা তাঁরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করেন। এমনি ধারায় আল্লাহ্তাআলার ফযলে হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই আকাঙ্ক্ষাটিও বাস্তবায়িত হচ্ছে যে, তাঁরা যেন প্রশ্ন করেন এবং তাঁদেরকে উত্তর দেয়া হয়।

তারপর, দাওয়াত ইলাল্লাহ্র জোশ ও উদ্দীপনা তিনি (আঃ) এভাবেও ব্যক্ত করেন ঃ "আমার পক্ষে সম্ভব হলে মনে এই চায় যেন আমি ফকীরদের মত দ্বাঁরে দ্বারে ঘুরে ফিরে খোদাতাআলার সত্য ধর্মের প্রচার করতে থাকি এবং পৃথিবীময় বিস্তৃত ঈমান বিনাশী শিরক ও কুফরী থেকে মানুষকে বাঁচাতে তবলীগ ও প্রচারের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেই, যদিও এই পথে আমি নিহত হইনা কেন" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯১)।

এখন তবলীগের প্রেরণা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরুন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। প্রত্যেক গৃহে পৌছুন এবং এই পয়গাম (বার্তা) পৌছে দিন যে, আল্লাহ্তাআলা 'আখারীন' (পরবর্তীগণ)-এর মধ্যে যে (উম্মতি) নবী পাঠাতে চেয়েছিলেন তাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর পশ্চাদানুসরণ করুন।

তারপর, তিনি (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলা যে চারটি সিফত নির্ধারণ করেছেন-যার উল্লেখ সূরা ফাতিহার শুরুত্বে রয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐ চারটিকে কাজে লাগিয়ে তবলীগ করেছেন। যেমন, প্রথমে 'রব্বুল আলামীন' আছে অর্থাৎ সাধারণ প্রতিপালন। সুতরাং 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহ্মাতাল্লীল আলামীন' (-আমরা তোমাকে সারা জাহানের জন্য 'রহমত' (করুণা) স্বরূপ করেই প্রেরণ করেছি)- আয়াত এরই দিকে ইঙ্গিত করে। তারপর, একটি জালওয়া রহ্মানীয়ত-এরও রয়েছে, অর্থাৎ তাঁর 'ফয়যান' বা কল্যাণ প্রবহমানতার কোন বিকল্প নেই। অনুরূপ ধারায় অন্যান্য সিফাতসমূহ" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮০)। এই যে উদ্ধৃতিটি তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্তাআলার গুণবাচক এই চারটি ফিফত দ্বারা আঁ হযরত (সঃ) কীভাবে তবলীগের কাজ করেন ? প্রকৃতপক্ষে, রবূবীয়তের মধ্যে নিহিত রয়েছে কারও তরবীয়ত করে তাকে উপরের দিকে উন্নীত করা। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) যাদের মুরব্বী (তরবীয়তদাতা) হন তাদের সকলকে নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যান। তাছাড়া, রবূবীয়ত দ্বারা লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করাও বুঝায়, অর্থাৎ সেবা করা, দুর্বলদের প্রতিপালনের আয়োজন করা, তাদের খাদ্যের যোগান দেওয়া। অতএব, এ যাবতীয় বিষয় এরূপ, যা আঁ হযরত (সঃ)-এর কর্মময় জীবনাদর্শ থেকে সপ্রমাণিত।

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখাসমূহ গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবেন। তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে, এই রবূবীয়তের থেকে কীভাবে উপকৃত হওয়া উচিত। তারপর হচ্ছে রহমানীয়ত- স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনন্ত দান। অযাচিতভাবে দানকারী তো নিজেই অন্যের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখে। কেউ তার কাছে চায়ও না। সুতরাং এমনি ধারায় যারা মুবাল্লেগ (বা দায়ী ইলাল্লাহ্) তাদের উচিত তারা যেন মানুষের অভাব বা প্রয়োজনগুলো আন্দাজ করে সেগুলোর অনুসন্ধানে লেগে থাকেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত দান করার অভ্যাস করেন। তাতে মানুষের অন্তর খুবই সন্তুষ্ট হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তাআলার ফযল ও করমে তবলীগের ক্ষেত্রে বরকত পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পরিশেষে বলেন, "তেমনি অন্যান্য সিফত রয়েছে অর্থাৎ সূরাতুল ফাতেহায় বর্ণিত যে সিফতসমূহ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বড়ই আকর্ষণ বিদ্যমান, এ গুণগুলোকে আত্মস্থ করুন (অনুকরণ করতে সচেষ্ট থাকুন)।"

অতঃপর, তিনি বলেন, "আসলে মু'মিনের উচিত তবলীগে-দীন-এর ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদের প্রতি খেয়াল রাখা। যেখানে নম্রতা আবশ্যক সেখানে যেন কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করে। আর যেখানে কঠোর ভাষা প্রয়োগ ব্যতীত ফলোদায়ের কোন আশা পরিলক্ষিত না হয় সেখানে নম্রতা প্রদর্শনও পাপ।" এরপর তিনি ফার্সি ভাষার একটি পংক্তি লিপিবদ্ধ করেন ঃ 'গার হিফ্যে মারাতেব না কুনি যিন্দিকী"- অর্থাৎ তুমি যদি মর্তবাসমূহের সংরক্ষণের প্রতি খেয়াল না রাখ তাহলে যিন্দীক (নাস্তিক) হয়ে যাবে। "লক্ষ্য করুন, ফেরাউন আপাতঃ কত শক্ত কাফির ব্যক্তি ছিল, কিন্তু খোদাতাআলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি এ নির্দেশই ছিল যে, "কূলা লাহু কওলান লাইয়েনান" - হে মূসা ও তার ভাই ! তোমরা উভয়ই ফেরাউনের সাথে নরম কথা বলবে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উদ্দেশ্যেও কুরআন করীমে অনুরূপ আদেশই রয়েছে ঃ "ওয়া ইন জানাহু লিস সিলমে ফাজনাহ্ লাহা" (-যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকো)। মু'মিনদের এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে নম্রতা ও দয়াদ্রতার আদেশ রয়েছে" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড পৃঃ ২৫৬-২৫৭)।

এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে তবলীগ। বিধর্মীদের মধ্যে তবলীগ করার বিষয়টি রয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে "মু'মিনদের এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে নম্রতা ও দয়াদ্রতার নির্দেশ রয়েছে" বাক্যটি মাঝখানে এসেছে। এর দ্বারা বুঝায় এই যে, আঁ হযরত (সঃ) মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহপরবশ হতেন - বিল্মু'মিনা রাউফুর রহীম অর্থাৎ খোদাতাআলার যে দু'টি গুণ - রউফ ও রহীম, তা আঁ হযরত (সঃ) কর্তৃক মু'মিনদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতো। কিন্তু তিনি সেই সাথে বিধর্মীদের প্রতিও বিনম্র ছিলেন। অতএব, এই উদ্ধৃতিটির ভুল অর্থ বুঝে নিয়ে এমনটি মনে করবেন না যে, কেবল মু'মিনদের সাথেই সদ্ব্যবহার করতে হবে, বরং আপনাদেরকে অন্যদের সাথেও অনুরূপ সদয় ও বিনম্র হতে হবে।

এ প্রসঙ্গেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ "আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা সম্বোধন করে বলেছেন ঃ 'ইয়া আয়্যুহান নাবীউ জাহিদিল কুফ্ফারা ওয়াল মুনাফিকীনা ওয়াগলুয আলায়হিম' কাফির ও মুনাফিকদের যদ্দুর সম্পর্ক তাদের ক্ষেত্রে তুমি শক্ত হও। এখানে

আয়াতটির অনুবাদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কঠোরতার অবশ্য উল্লেখ করেন নি, বরং বলেছেন, "পরিষ্কার জানা গেল যে, খোদাতাআলা মর্তবা ও স্তরসমূহের তারতম্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন।" তবে পরিশেষে বলেছেন, "কাফিরদের মধ্যে কতিপয় লোকের স্বভাবই এরূপ হয়ে থাকে যে, তাদের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যক হয়। যেমন, কোন কোন রোগ বা জখমের ক্ষেত্রে দক্ষ চিকিৎসকের পক্ষে কাটা ছিঁড়া এবং অস্ত্রপ্রচারের সাহায্যে কার্যসমাধা করতে হয়" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, নব সংস্করণ, পৃঃ ৫২৬-৫২৭)।

এই কঠোরতা বলতে এই বুঝায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও তাঁর তবলীগের ক্ষেত্রে কোন সময় শত্রু যখন অত্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে যেতো তখন (অননুপায় হয়ে) তার ওপরে অস্ত্রপ্রচারের কাজ করে দেখাতেন। বিশেষতঃ যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানরা সীমাতিরিক্ত বেয়াদবি ও সম্মান হানি করে, তখন তিনিও (আঃ) তাদের ওপর অস্ত্রপ্রচার স্বরূপ কাজ করে দেখান এই বলে যে, যীশুকে যখন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চে' শ্রেষ্ঠ মনে কর তখন লক্ষ্য কর যীশুর নিজের অবস্থা তার স্বীকারুক্তি অনুযায়ী ছিল এরূপ এবং সেরূপ। তবে সেক্ষেত্রে তিনি (আঃ) 'মসীহ্' বলেননি, বরং যীশু বলেছেন-বাইবেলে সে নামটিই এসেছে-যেখানে তারা তাঁর দুর্বলতাসমূহের এবং তাঁর নানীদের দুর্বলতাগুলোর উল্লেখ করেছে সেখানে তারা যীশুর উল্লেখ করেছে। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও বাইবেলের বরাতে ঐ দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেছেন। আর এটা হচ্ছে কঠোরতার আবশ্যকীয় স্থান। এটাকে বলা হয় চিকিৎসকের অস্ত্রপ্রচার। কাজেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তর স্বভাবত নম্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন কোন বিষয়ে শত্রুকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, 'দেখুন, আপনারা আমাদের প্রিয় রসূলুল্লাহ্র ওপর এই রকম জুলুম করবেন না। তিনি (সঃ) তোমাদের ওপর ইহ্সান ও মহা উপকার করেছেন। তিনি না হলে তো আমরা আপনাদের মহাপুরুষদেরকে মানতেই পারতাম না, আপনাদের বুজুর্গদের কোন পরোয়া করতাম না, ইহা খাতামান্নবীঈনেরই ইহ্সান যে, তিনি দুনিয়ার সকল নবীকে মানতে বাধ্য করে ছেড়েছেন। আর এই ইহ্সানের বদলা তোমরা দিয়েছো এই জুলুম অত্যাচারের দ্বারা! অতএব, এই হিসেবে তাদের ওপরে অস্ত্রপ্রচার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেছেন, যাতে একবার হলেও তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং তারা বুঝে যায় যে, অন্যকে কষ্ট দিলে কীরূপ ক্ষতি করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ প্রসঙ্গেই নিজের একটি ঘটনা লিখেন, "আলীগড়ের এক ব্যক্তি যথাসম্ভব তিনি তহ্শীলদার ছিলেন। আমি তাকে কিছু নসীহত করেছিলাম। তিনি আমার প্রতি বিদ্রূপ করতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম, আমিও আপনার পিছন ছাড়ছি না। অবশেষে কথা বলতে বলতে তার ওপর সে মুহূর্ত উপস্থিত হলো যে, কোথায় সে আমার প্রতি বিদ্রূপ করছিল, আর এখন সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।" সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রশ্নোত্তর কালে চিনতে পারলো এবং বুঝে গেলো, সে যে আগে তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করেছিল তা সে ভয়ানক অন্যায় করেছে, তা সে প্রকৃতপক্ষে নিজের জানের ওপরই যুলুম করেছে। অতএব এ প্রসঙ্গে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্কেতা ব্যক্তিকে আপাতঃ এরূপ মনে হয় সে যেন হতভাগা কঠোরচিত্ত।"

অতএব, তবলীগের ক্ষেত্রেও আপনাদের এরূপ লোকের সাথে পালা পড়বে, বাহ্যতঃ যাদেরকে হতভাগা কঠোর হৃদয় বলে প্রতীয়মান হবে কিন্তু হিকমতের সঙ্গে যদি আপনারা কথা বলতে থাকেন তাহলে কোন কোন পাথর থেকেও প্রস্রবণ ফুটে পড়ে যেমন কিনা কুরআন করীমে উল্লেখ এসেছে। কাজেই এই পাথর হৃদয়গুলি থেকেও আল্লাহ্তাআলার করুণার প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়ে পড়বে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, "স্মরণ রাখবে যে, প্রত্যেক তালার জন্য যেমন একটা চাবি থাকে, তেমনি প্রত্যেক কথা বা বিষয়ের জন্যও চাবি নির্ধারিত আছে। তা হচ্ছে সমুচিত ধরন ও পদ্ধতি। তোমাদের কথার মধ্যে সে চাবিটি হচ্ছে তোমাদের হৃদয়ের নম্রতা এবং কথা বলার ভঙ্গী ও পদ্ধতি, যেমন ঔষধ সম্পর্কে আমি এই মাত্র বলে এসেছি যে, কোনটি কারও জন্য উপকারী হয়, আবার কোনটি অন্য কারও জন্য। তেমনি প্রত্যেক কথা কোন বিশেষ আকারে বিশেষ ব্যক্তির জন্য উপকারী হতে পারে। সবার সাথে একই রকম বলবে তা নয়। বরং বক্তা বা **তবলীগকারী ব্যক্তির উচিত, কেউ কিছু খারাপ বলাতে রুষ্ট হবে না বরং নিজের কাজ করে যাবে এবং ক্লান্ত হবে না। ধনী লোকদের মেযাজ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে এবং তারা বেপরোয়া হয়ে থাকে। বেশী কথা তারা শুনতে পারেন না।** তাদেরকে কোন উপলক্ষ্যে, কোন বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত নম্রভাবে উপদেশ দান করা উচিত" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, নব সংস্ককরণ, পৃঃ ৪৪১)।

অতঃপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'দুনিয়াতে তিন প্রকার লোক হয়ে থাকে-জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত এবং ধনী। **জনসাধারণ সাধারণতঃ কম বোঝে, তাদের বুদ্ধি মোটা ধরনের হয়ে থাকে। সেজন্যে তাদেরকে বুঝানো বড়ই কঠিন হয়।" তারা তাদের মৌলবীদের দিকে ঝুঁকে থাকে, তাদের বড়দের দিকে তারা যায়। তাদের বাদ দিয়ে নিজেরা বুঝে যাবে তা খুব কঠিন ব্যাপার।** বলেছেন, "তাদের ওপর যত সময়ই ব্যয় কর তাতে ক্ষতি নেই। **তাদেরকে প্রীতি-ভালবাসার সাথে বোঝাতে থাক; অবশেষে তারা তোমাদের হয়ে যাবে এবং নিজেদের ভ্রান্ত নেতা ও পথ-প্রদর্শকদের ছেড়ে দেবে।"**

"ধনীদেরকে বোঝানোও কঠিন হয়ে থাকে। কেননা তারা হয়ে থাকে স্পর্শকাতর এবং ত্বরিৎ বিগড়ে যায়, ঘাবড়ে যায়। তাদের অহংবোধ ও আত্মশ্লাঘা আরও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। **সেজন্যে তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাদের ধরন অনুযায়ী কথা বলা উচিত, অর্থাৎ সংক্ষেপে, তবে সারগর্ভ হতে হবে। কিন্তু জনসাধারণকে তবলীগ করার জন্য বক্তব্য খুবই স্পষ্ট, সরল ও সহজ বোধ্য হওয়া উচিত। আর যারা মধ্যবিত্ত, তারা বেশীর ভাগই তবলীগের যোগ্য হয়ে থাকে; তাদেরকে তবলীগ করা উচিত।** তারা কথা বুঝে ওঠতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষিতও এই মধ্যবিত্তরাই। যদি এই শ্রেণীর লোক শিক্ষিত না-ও হয় তবু কথা বোঝার এবং শোনার অভ্যাস তাদের মধ্যে থাকে। তাদের মনমানসিকতায় অহংবোধ, আত্মশ্লাঘা এবং স্পর্শকাতরতা থাকে না যা ধনীদের হয়ে থাকে। সেজন্য তাদেরকে বুঝানো খুব কঠিন হয় না" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬১-১৬২)।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট শাহ্যাদা মুহাম্মদ ইব্রাহীম খান সাহেব প্রশ্ন করেন, "আপনি সবসময় কাদিয়ানে অবস্থান করার পরিবর্তে পাঞ্জাব এবং হিন্দোস্থানের বিভিন্ন শহর সফর করে যদি ঘুরে ফিরে ওয়ায এবং তবলীগের কাজ করেন তাহলে বেশী লাভজনক হবে। (ওরূপ কেন

করেন না) ?" এখন, কে জানে তিনি কী ক'রে সাহস করলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কথা বোঝাবার ! কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাতে খারাপ কিছুই মনে করলেন না, অসন্তুষ্টও হলেন না বরং সবিস্তারে এর উত্তর প্রদান করলেন। অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তো এক সময় সারা হিন্দোস্থানে সফর করেন এবং ঘুরে ফিরে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কে জানে, সাহেবযাদা সাহেবের সে-দিকে কেন খেয়াল যায় নি। তবে যাই হোক, তিনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ এর উত্তরে বললেন ঃ 'আসল কথা এই যে, অবস্থা বুঝে তবলীগের সময়োপযোগী উপায়-উপকরণ আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। এই যুগের স্বাধীনতা যদিও উত্তম একটি বিষয়, কিন্তু একই সাথে এর মধ্যে খারাপিগুলোও রয়েছে। আপনি যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন আমি তবলীগের এ পদ্ধতিটিও ব্যবহার করেছি এবং বহু জায়গায় এতদুদ্দেশ্যে সফরও করেছি। কিন্তু অভিজ্ঞতামূলে তাতে দেখা গেছে যে, আসল উদ্দেশ্য যথাযথভাবে লাভ হতে পারে না। বক্তৃতা প্রদানকালে কিছু লোক (আপত্তির সুরে) কিছু বলতে শুরু করে দেয়, দু'চারটা গালিও শুনিয়ে দেয় এবং চেঁচামেচি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এই লাহোরেই একবার, অথচ আমাদের নিজস্ব বাড়ী ছিল এবং পুলিশ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি বহু লোকের সমাগমে (আমার) বক্তৃতা চলাকালে উঠে দাঁড়ালো এবং মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করলো। তাতে মিয়া মুহাম্মদ খান সাহেব (মরহুম), যিনি আমাদের বড়ই মুখলেস, নিষ্ঠাবান, মহব্বতকারী ব্যক্তি ছিলেন, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিলাম এই বলে যে, (বিরুদ্ধবাদীদের মত) অনুরূপ উগ্রতার ভূমিকা গ্রহণ করা আমাদের নৈতিকতার পরিপন্থি। মোটকথা, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী এবং সিয়ালকোট ইত্যাদি শহরের আমরা ভালভাবে অভিজ্ঞতা করে নিয়েছি যে, এই ব্যবস্থাপত্র ফেৎনা থেকে মুক্ত নয়, বরং অনিষ্টের আশংকাই বেশী। সুতরাং অমৃতসরে আমাদের প্রতি পাথর ছোঁড়া হয়েছে, একটি পাথর আমার ছেলেরও এসে লাগে। জামাতের কয়েকজন বন্ধুর গায়ে জুতোও এসে পড়ে। 'লা ইউল্‌দাগুল্ মু'মিনু মিন জুহ্‌রিওঁ ওয়াহেদিন মার্‌রাতাইন" (হাদীস)-একই ছিদ্র দিয়ে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না। অতএব, পরীক্ষিত ব্যবস্থা-পত্রকে আমরা কীরূপে পুনরায় পরীক্ষা করতে পারি ?"

তারপর বলেন, "দ্বিতীয় খারাপি হচ্ছে এই যে, মৌখিক কথোপকথন ও ভাষণের ক্ষেত্রে অনুলিপি লিখকরা (বা প্রতিবেদনকারীরা) যা মনে চায় তাই বানিয়ে দেয়, তারা ইচ্ছা করলে তিলকে তাল বানাতে পারে। কলম তাদের হাতে। আবার দুষ্কৃতিমনা কিছুলোক এরূপ আছে যে, দু'ঘন্টা ধরে তাদেরকে বোঝানো হয় কিন্তু মৌখিক বক্তৃতাগুলোতে যেহেতু মানুষ চিন্তা করার খুব কম সুযোগ পায় এবং মৌখিক বক্তৃতাগুলো হয়ে থাকে অনেকটা তাৎক্ষণিক ও স্বল্পস্থায়ী।" অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রশ্ন করা হয় এবং তার জওয়াব দিতে হয়– এই তাৎক্ষণিক অবস্থাটির প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না, "সেজন্য বাধ্যতাবশতঃ এই পন্থাটি (সাধারণভাবে) পরিহার করতে হলো এবং ধারাবাহিক লিখন ও প্রণয়নের মাধ্যমে হুজ্জৎ (যুক্তি-প্রমাণ) পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমি (এযাবৎ) সত্তর / পচাত্তরটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে এরূপ সার্বিক যে, সত্যের প্রত্যাশী এবং অনুসন্ধানে আগ্রহী যে কেউ যদি এই পুস্তকসমূহ মনোযোগসহ পাঠ করে তাহলে এগুলো তার নিকট সত্যাসত্য নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য ভান্ডার স্বরূপ না হয়ে পারে না।"

"আমি আমার জীবনকালে তত্ত্ব-তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়াবলীর এক বিশাল ভান্ডার সংগ্রহ করেছি এবং যথাসম্ভব সেগুলোর প্রকাশ ও প্রসারও করা হয়েছে। শত্রু-মিত্র সবাই তা পাঠও করেছেন। মৌখিক বক্তৃতা ও বর্ণনার সময়কাল স্বল্পপরিসর হয়ে থাকে। মানুষ তাতে গভীর মনোনিবেশের সুযোগই পায় না। কেননা, তারা তো নিজেদের ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে কিছু শোনা মাত্র অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে এবং উত্তেজনাবশতঃ তাদের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে, সে ব্যক্তির পুস্তক-পুস্তকাদি নিয়ে যদি মানুষ পৃথক কামরায় (নির্জনে) বসে পড়ে তাহলে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করারও সুযোগ পায়। আর যেহেতু তখন প্রতিপক্ষ কেউ থাকে না সেজন্য নিরপেক্ষ মনমানসিকতা নিয়ে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করার ভালো সুযোগ পায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি অপর পন্থাটিও হাত ছাড়া করি নি এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরে গিয়েছি, তবলীগ করেছি। কতিপয় জায়গায় তো ইট-পাথর বর্ষণের মাধ্যমে তারা আমাদের সম্মুখীন হয়েছে। তবুও আপনার দৃষ্টিতে তবলীগ করা হয় নি" (মলফুযাত, ৫ম খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৫৭৮-৫৭৯)।

তবে হযরত শাহ্‌যাদা সাহেব ছিলেন তো মসীহ্ মাওউদের প্রেমিক কিন্তু কথা এরূপ বলেছিলেন যার দরুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মর্মাহতও হন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্নেহ, ভালবাসা এবং সহিষ্ণুতার সাথে তাঁকে সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের নিকট বলতে চাই যে, দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্‌দের জন্যও আমরা প্রচুর বই পুস্তকের ভান্ডার সরবরাহ করেছি। তাতে বিভিন্ন দেশে উত্থাপিত বিভিন্ন ধরনের আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয়েরও উত্তর দেয়া হয়েছে। ওডিও-ভিডিও ক্যাসেটস্-এর মাধ্যমেও আমরা দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্‌র-এর ঝোলা প্রতিরোধমূলক অস্ত্র সম্ভারে ভরে দিয়েছি। তাঁরা যেখানেই যান, ক্যাসেটস্ শুনিয়ে সেগুলো কাজে লাগান। এবং আগে যেমন বলে এসেছি, বই-পুস্তক, পামফ্লেট ইত্যাদি বিতরণ–এগুলোর সাহায্যে তাঁরা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। অতএব, **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তবলীগের যতগুলো পথের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, সে সবগুলোর ওপরই আমরা আজ আল্লাহ্‌র ফযলে সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছি।** এবং আমি আশা রাখি যে, এগুলোর অতি মহান সুফলসমূহ ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা তবলীগের সকল উপায়-উপকরণ একত্র করে দিয়েছেন। সুতরাং ছাপাখানার যাবতীয় উপকরণ, কাগজের বিপুলতা, ডাক, টেলিযোগাযোগ, রেলগাড়ী, স্টিমার ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র জগৎ একটি শহরের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

যেমন আগেও আমি বলে এসেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় উড়োজাহাজও আবিষ্কার হয়েছিল এবং মানুষ আকাশে উড়তেও শিখেছিল। অতএব কেবল সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমেই নয় বরং তাঁর আমলেই উড়ো জাহাজের মাধ্যমেও আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পবিত্র বাণী পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর, ক্যাসেটস্-এর যদ্দুর সম্পর্ক, এরও তখনই উল্লেখ করেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই অর্থে যে, "এখন ফনোগ্রাফের মাধ্যমেও (আপনারা) তবলীগের কাজ চালাতে পারেন।" বস্তুতঃ ফনোগ্রাফও ক্যাসেটের-ই সূচনার একটি প্রারম্ভিক রূপ। কাজেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামানায় (এ জাতীয়) যতগুলো জিনিষ আবিষ্কার হয় তা

সবই এখনও জামাতের নিকট তবলীগের মাধ্যমস্বরূপ, ইসলামের জন্য প্রতিরোধমূলক রূহানী হাতিয়ারস্বরূপ সক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত। এরূপ একটি আবিষ্কারও নেই যা আমাদের সময়ে হয়েছে, অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তা হয় নি। সুতরাং তিনি বলেন, "ফনোগ্রাফের দ্বারাও তবলীগের কাজ নিতে পারেন। এর মাধ্যমে সত্যি বড়ো অদ্ভুত কাজ সাধিত হয়। তাছাড়া পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা ইত্যাদি অর্থাৎ তবলীগের উপযোগী এতো সব উপকরণের (আজ) সমাবেশ ঘটেছে যে, এর নজির আগের কোনও যুগে আমরা খুঁজে পাই না। বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে দীনের (বা ধর্মের) পরিপূর্ণতাও ছিল অন্যতম। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছিল ঃ "আল্ ইয়াওমা আকমাল্‌ত লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্‌মাম্‌তু আলায়কুম নে'মাতি" (-'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নে'মতকে তোমাদের ওপর সার্বিক মাত্রায় ন্যাস্ত করলাম' – অনুবাদক)। এখন, এই পরিপূর্ণতার মাঝে দু'টো বৈশিষ্ট্য ছিল। এক, হেদায়াতের পরিপূর্ণতা। দুই, হেদায়াত প্রসারের পরিপূর্ণতা। হোদায়াতের পরিপূর্ণতার যুগটি তো ছিল আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম যুগ (তাঁর জীবদ্দশায় - অনুবাদক)। হেদায়াত প্রসারের পরিপূর্ণতা সাধনের যুগ হচ্ছে তাঁরই দ্বিতীয় যুগ, যখন "ওয়া আখারীনা মিনহু লাম্মা ইয়াল্‌হাকূ বিহিম" (সূরাতুল জুমুআ)-এর সময়কাল উপস্থিত হবে। বস্তুতঃ সে-সময়টি হচ্ছে এখন অর্থাৎ আমার জামানা তথা মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত)-এর জামানা। সেজন্যে আল্লাহ্‌তাআলা হেদায়াতের পরিপূর্ণতা এবং হেদায়াত প্রসারের পরিপূর্ণতার যুগ দু'টিকেও এইভাবে পরস্পর যুক্ত করেছেন। বস্তুতঃ এটিও অসাধারণ মহাসংযোগ। অতঃপর এ ওয়াদাও রয়েছে যে, সকল ধর্মসমূহের সমাবেশ ঘটানো হবে এবং একটি ধর্ম (দীনে-ইসলাম)-কে জয়যুক্ত ও প্রাধান্য দান করা হবে। ইহাও মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সময়ের অন্যতম সংযোগ। কেননা, "লে-ইউয্ হিরাহু আলাদ দীনে কুল্লিহী" (যেন তাকে তিনি সকল দীনের ওপরে জয়যুক্ত করেন– সূরাতুস্ সাফ্) – সকল মুফাস্‌সিরগণের সর্বসম্মত মত ও স্বীকৃতি অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদের যুগেই সংঘটিত হবে" (মলফুযাত, ২য় খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৪৯-৫০)।

এরপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের ওয়াকেফীন (জীবন ওয়াক্‌ফকারীগণ)-এর প্রবর্তিত ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। আমি আগেও যেমন বলেছি, **কোনও এরূপ বিষয় নেই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে প্রতর্বন করেন নি। যে প্রদীপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের হাতে ধরিয়েছিলেন সে প্রদীপ নিয়েই আমরা সম্মুখে এগোচ্ছি।** তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা তিনি নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেন ঃ "এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের পেতে হবে যারা তাদের জীবন এই পথে উৎসর্গ (ওক্‌ফ) করেন।" এখন লক্ষ্য করুন কতো বিপুল সংখ্যায় ওয়াকেফীন সৃষ্টি হয়েছেন। তারপর 'ওয়াক্‌ফে নও'-এর মাধ্যমে এই ধারাবাহিক ব্যবস্থা অধিকতর বিস্তার লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবীগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে দূরদূরান্তের দেশগুলোতে চলে যেতেন।" এখন আফ্রিকা ইত্যাদি এবং অন্যান্য দূরবর্তী দেশগুলোতে খোদাতাআলার ফযলে আহমদী মুবাল্লেগরা গমন করে থাকেন। অতএব, ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা এই আকারে পূর্ণ হচ্ছে। তিনি (আঃ) বলেন, "এই যে চীনদেশে কয়েক কোটি মুসলমান রয়েছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানেও সাহাবা (রিযওয়া নুল্লাহে আলায়হিম)-এর মধ্য থেকে কেউ পৌছেছিলেন।" সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই ধারণাটি একশ' ভাগ সত্য। কেননা, এখনও সেখানে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবার কবরসমূহ বিদ্যমান, যাঁরা তবলীগের মাধ্যমে চীনদেশে ইসলামের বাণী পৌছিয়েছিলেন। সেজন্য, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তলোয়ারের জিহাদের অপবাদ আরোপ করে তারা দেখাক, কোন্ তলোয়ার নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ সাহাবীগণ যারা চীনে কোটি কোটি লোককে মুসলমান বানিয়েছিলেন? তা নিঃসন্দেহে তাঁদের এ পদ্ধতিটি-ই ছিল যে, তাঁরা প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা ও প্রজ্ঞার দ্বারা লোকদেরকে তবলীগ করেন। তারপর, তারাও আবার তবলীগ করতে থাকে। নইলে, মুষ্টিমেয় সাহাবার পক্ষে কোটি কোটি লোকের নিকট বাণী পৌছানো ছিল সধ্যাতীত। সেখানকার লোকেরা সে-বাণী শ্রবণ ও গ্রহণ করার পর অন্যদের নিকট তা পৌছিয়েছে। এমনি ধারায় এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত বিস্তার লাভ করতে থাকে।

তিনি (আঃ) অতঃপর আরও বলেন, "যদি এইরূপে বিশজন কি ত্রিশজন ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় চলে যান তাহলে অতি শীঘ্র (দ্রুতবেগে) তবলীগ হতে পারে"। যেখানে বিশ / ত্রিশ জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), সেখানে আল্লাহ্‌তাআলা কতজন দিলেন ? এখন বিশ কেন, হাজার হাজার ওয়াকেফীন হয়ে গেছেন এবং দূর দূরান্তে সফর করে সেখানে তারা পৌছেন এবং তবলীগ করে থাকেন। কিন্ত সেই সাথে তবলীগের ক্ষেত্রে 'কানায়াত' (স্বল্পে তুষ্টিবোধ)-এর আবশ্যকতা সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক তাতে উত্তীর্ণ এবং স্বল্পে তুষ্ট থাকতে যত্নবান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পুরোপুরি এই কাজের অথোরিটিও দিতে পারি না" (মলফুযাত, ৫ম খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৬৮২)। এখন লক্ষ্য করুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করে, স্বল্পে তুষ্ট আহমদী মুবাল্লেগগণ পূর্বেও সৃষ্টি হয়েছিলেন, এখনও হচ্ছেন। তাঁরা শুকনো রুটি এবং মরিচের ওপর কালাতিপাত করেছেন কিন্তু তবলীগের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেন নি। অসাধারণ মর্যাদাপূর্ণ খিদমতসমূহ তাঁরা পেশ করে গেছেন এবং এখনও করছেন– এর স্বাক্ষর বহন করে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ।

অতএব, আল্লাহ্‌আআলার ফযলে তবলীগের এই ধারা তো বিস্তার লাভ করতেই থাকবে। তা রোধ করা যাবে না। অসম্ভব। দুশমন যে দেয়ালই খাড়া করবে আহমদীয়ত সে- দেয়াল টপকিয়ে আগে বেড়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আহমদীয়া মুসলিম জামাত আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপদেশ-বাণী অনুযায়ী স্বল্পে তুষ্ট সেবকবৃন্দের মাধ্যমে, দীনের আশেক প্রেমিকবৃন্দের মাধমে, গাছ-পাছালের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করেও ইসলামের বাণীকে ক্রমাগত সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। **খোদা করুন যেন সে মুহূর্ত শীঘ্র আসে এবং আমরা এ বছর দ্বিগুণ হবার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পুনরায় দেখি– যেখানে বিগত বছর এক কোটি নতুন আহমদী দান করা হয়েছিল সেখানে এ বছর যেন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ফযলক্রমে দুই কোটি আহমদী প্রদান করেন। ইনশাআল্লাহ্।**

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
সদর মুরব্বী

আমি সাচ্চা মুসলমান

ইসলামের প্রবর্তক আঁ হযরত (সঃ)-কে আমি কেবল স্বর্গাগত পবিত্র রসূল বলেই স্বীকার করি না বরং তাকে খাতামান্ নবীঈন হিসাবে মান্য করি ও ভক্তি করি। তাঁর ভাব-বাণী মতে আখেরী জামানায় আগত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে ইমাম মাহ্দী ও মসীহে মাওউদ বলেও বিশ্বাস করি। তাঁর পবিত্র আদেশ অর্থাৎ ধর্মের নামে যুলুম ও রক্তপাতকে আমি ভয়ঙ্কর নিন্দনীয় কাজ বলে বিবেচনা করি। আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করি ও সত্যকে আলিঙ্গণ করি। আরাফাতের ময়দানে রসূল করীম (সঃ) প্রদত্ত নির্দেশনা মতে আমি ইসলামকে সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণের প্রয়াসে অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় করি ও সেই সাধনায় ব্রত আছি। আমি আমার অন্তরের গভীর ভালবাসা দিয়ে কলেমা পাঠ করি, রোযা পালন করি। সালাত কায়েমে সচেষ্ট আছি ও হজ্জ গমনকে অবশ্যই পুণ্যময় কর্মবলে বিশ্বাস করি। আমি কারো মসজিদ, মন্দির কিংবা গীর্জা ভাঙ্গি না এবং জবর-দখলও করি না বা কোন ধর্মের উপাসনালয়কে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করি না বা কাউকে এ ধরনের নেচ্ছ কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্ররোচনা দিই না। ধর্মে বল প্রয়োগ করাকে আমি ভীষণভাবে ঘৃণা করি। কারণ ইহা খোদার ইচ্ছার বিরোধী কর্ম। সুতরাং ইহা অপবিত্র ও অ-ইসলামী কাজ বলে আমি জানি ও মানি। পক্ষান্তরে স্ব স্ব ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে আমি কখনও কারোর আত্মার বিরুদ্ধে তাড়না দিই না এবং এসব কর্ম সত্য ধর্ম বিরোধী ও কু-প্রবৃত্তির কুকীর্তি বলে আমি বিবেচনা করি। আমি ওয়াদা পালনে সদা নিষ্ঠাবান এবং নিজে যা করি না– তা অন্যকে করতে বলি না, "তোমরা যা করনা তা কেন বলো"–খোদার এ পবিত্র বাণীকে আমি সর্বান্তঃকরণে সম্মান করি। তাই আমি বাগাড়ম্বর করাকে বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলে বিবেচনা করি। আমি কুরআনের প্রতিটি অক্ষর ও বিগত নবী রসূলগণকে আরশে ইলাহী হতে আগত বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তাই কুরআনের কোন একটি আদেশ–নিষেধের চুল পুরিমাণ পরিবর্তনকেও আমি জঘন্যতম পাপ কর্ম বলে মনে করি। আমাকে কেউ গালি দিলেও আমি তাকে গালি দেই না, উপরন্তু তার হেদায়াতের জন্য খোদার দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি। প্রতিবেশীর কল্যাণের প্রতি সদা সচেতন দৃষ্টি রাখি। হাসি মুখে কথা বলাকে আমি একজন আদর্শ মুসলমানের সুন্দর বৈশিষ্ট্য বলে জ্ঞান করি এবং খোদার সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণীর কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করি। আমি একান্তভাবে বিশ্বাসী যে, আত্মার মুক্তি লাভের লিপ্সায় মহানবীর আদর্শ ও কুরআনের প্রতিটি অনুশাসনকে নিবিড়ভাবে অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয় আর সেই সুবাদে আমি সেই সকল অনুশাসনকে অনুকরণ করতে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করি। আমি সর্বকাজে ও সর্বক্ষেত্রে পরম করুণাময় খোদার অনুকম্পা প্রাপ্তির প্রত্যাশী। বিশ্ব-মানবের জন্য আগত নবী-শ্রেষ্ঠ (সঃ) মৃত্যু বরণ করে মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে আছেন আর কেবল বনী ইস্রাঈল জাতির জন্য আগত নবী হযরত ঈসা (আঃ) দুই হাজার বছর অবাধ সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এহেন অলীক বিশ্বাসকে আমি সর্বৈব অবিশ্বাস করি। আমি খোদার নির্দেশানুসারে আমার উপার্জনের নির্দিষ্ট একটা অংশ ইসলাম সেবার প্রয়োজনে নির্ধারিত 'বায়তুল মালে' জমা রাখি যা যুগ-খলীফার তত্ত্বাবধানে যথা নিয়মে খরচ করা হয়। আমি কারো অধিকার হনন করি না এবং অন্যের ধনের প্রতি কভু-কখনও লালসা করি না। আমি হাশর-নশর ও পরকালের আয়োজনকে প্রকৃষ্ট সত্য বলে বিশ্বাস করি, তাই ধর্মের সত্যতা নির্বাচনে আমি পীর ফকীর কিংবা মোল্লা পুরোহিতদের ওপর ভার দিয়ে নিজে কখনও গা-ভাসিয়ে চলার চেষ্টা করি না। আমি প্রণিধান করি যে, নবী গুরু আঁ হুযূর (সঃ)-এর ভবিষ্য-বাণীর মর্মানুসারে তের শতাব্দীতে তেরজন মোজাদ্দিদ এসেছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দিতে "আলা মিন হাজিন নবুওয়ত" সিদ্ধান্ত মতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে মুজাদ্দিদ ও উত্তম নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কাজেই তাঁর বিরোধিতা করা অথবা তাঁর প্রতিপক্ষে দাঁড়ানোকে আমি পরম সত্যের চরম বৈরিতা বলে মনে করি। আমি ইহাও সঠিক বলে মনে করি যে, বর্তমান যুগই স্বর্গ হতে সত্য আসার প্রকৃত যুগ। কারণ এ যুগেই ধর্মের পঙ্কিলতা, সমাজে ফাসেক নেতা- বাদ্য যন্ত্রের প্রসারতা, মাপে কম দেয়ার প্রবণতা, মুসলমানগণের শতধা বিভক্তি, সম্পদের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এন্তার কর্ম অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আরবী (সঃ)-এর হাদীসকে ঝক্‌ঝকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। বর্তমানে সম্পাদিত মানব অহিতৈশী কর্ম যেমন– রাজনীতির নামে হরতাল, মিছিল প্রভৃতি সন্ত্রাসী কর্ম, মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনর্গল অলীক ভাষণ দেয়া ইত্যাকার কর্মকে আমি দুষ্কর্ম বলে বিবেচনা করি। সর্বোপরি আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, কোন আহমদী মুসলমান ছাড়া পৃথিবীর কোন ধর্মাবলম্বীই এমনকি কোন সাধারণ মুসলমান- ও ধর্মের ব্যাপারে এর অর্ধেক পরিমাণ বিশ্বাসও হৃদয়ে পোষণ করেন না এবং নিজেকে এসবের অনুসরণে চালনায় ব্রত নহেন। তাই আমি সুকঠিন দৃঢ়তায় এই ঘোষণা দিতে পারি যে, হ্যাঁ, "আমি অবশ্যই একজন সাচ্চা মুসলমান।"

এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ আমাকে কোন কৌশলে অমুসলমান বলার চেষ্টা করেন বা কাউকে উস্কানী দিয়ে একাজে অনুপ্রেরণা যোগান অথবা আমাকে অমুসলমান বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য দেশের সংসদের সাহায্য যাচ্ঞা করেন তবে আমি নির্ঘাত ইসলামের প্রথম যুগের বিধানানুসারে আমার জন্যে তরবারি দ্বারা সেই দুষ্ট-তস্কর জনের মুন্ডু কেটে লন্ড ভন্ড করে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারি। কিন্তু হায়! এহেন জটিল কম সাধন করা আমার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যুগের পবিত্রতম পুরুষ ইসলামের আখেরি যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কর্মাবলীর বিশেষ কর্মটিই হলো, "ধর্মের নামে বল প্রয়োগ ও রক্তপাতকে রহিত করা।" কাজেই যদিও হাতে তরবারি নেয়া আমার জন্য সঙ্গত হবে না, তথাপি মুখে নিশ্চয় এ দোয়া করা যাবে যে, "হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা ! তুমি তাহাদিগকে একেবারে খন্ড-বিখন্ড করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেল, মিথ্যাবাদীদের উপর তুমি তোমার লা'নত বর্ষণ কর।"

– মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

স্মৃতিপটে বাংলার দক্ষিণাঞ্চল

প্রথম দক্ষিণ বাংলা সফরের সৌভাগ্য হয় আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী বছর ১৯৮৯ সনে। উদ্দেশ্য, পটুয়াখালীর ১ম বার্ষিক জলসায় যোগদান। পুরান বাজার

১৯৮৯ঃ পটুয়াখালী জামাতের প্রথম জুবিলী জলসায়।

এলাকার শিকদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই জলসা। রাবওয়ায় পড়াশুনা শেষ করে সবেমাত্র দেশে ফিরেছিলাম। তাই ১৯৮৯ সনের প্রথম দিকেও ভাষার জড়তা কাটে নি। জানি না কতটুকু কথা কীভাবে বলেছিলাম। তা সত্ত্বেও আহমদী অ-আহমদী নির্বিশেষে সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলাম। সেবার সফর সঙ্গী ছিলেন মরহুম জনাব খন্দকার সালাহউদ্দীন ও জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। সেই সফরে খাকদান, কৃষ্ণনগর ও কুকুয়ায় যাবারও সুযোগ হয়েছিল। পল্লী বাংলার ছায়াঘেরা মায়াবী অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দক্ষিণ বাংলার ফসলের জমি যেমন দিগন্ত-বিস্তৃত, তেমনি এখানকার মানুষের মনও প্রশস্ত। এখানকার গাছ-গাছালি ঘেরা বাড়ী-ঘর ও জঙ্গলে যেমন শোনা যায় পাখ-পাখালীর কলতান, তেমনি এদের আঞ্চলিক ভাষাতেও ঝংকৃত হয় অদ্ভুত সুন্দর সুললিত টান। এখানকার খেজুর রস যেমন মিষ্টি তেমনি এদের স্বভাব ব্যবহার আর আচরণও সুমিষ্ট। প্রথম সফরেই এই এলাকার ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। সেই থেকে আরম্ভ। এরপর কয়েকবার যাবার সুযোগ হয়েছে বরিশাল, পটুয়াখালী, খাকদান ও কুকুয়া জামাতে, আরও সুযোগ হয়েছে বাকেরগঞ্জ ও কুয়াকাটা পরিদর্শনের। একই সাথে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে আমার মনের সেই আকর্ষণ। এখানে গোটা বছর শোনা যায় কোকিলের ডাক, চৈত্র মাসে রাতদিন একটানা চলে ঝিঝি পোকার শব্দ, এর সর্বদক্ষিণ প্রান্ত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটায় দেখা যায় বিরল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য। গত বছর জনাব ন্যাশনাল আমীর, প্রথমবার এ অঞ্চলের জামাতী সফর করেন। এরপর থেকে তাঁর সুদৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদানের কারণে বরিশাল- পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলে জামাতী কার্যক্রম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে জামাতের মুরব্বী **জনাব শামসুদ্দীন আহমদ মাসুমের** অক্লান্ত পরিশ্রমে এক বছরে দু'টি হালকায় নতুন মসজিদ স্থাপিত হয়েছে।

এবারও কয়েকটি জামাতী জলসা উপলক্ষ্যে ২২ মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ দক্ষিণ বাংলায় সফরে গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী রুটে চমৎকার লঞ্চ সার্ভিস রয়েছে। যারা এই লঞ্চের কেবিনে সফর করেন নি বিশাল বাংলার একটা বড় অংশের সাথে তারা এখনও অপরিচিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বোৎকৃষ্ট সফর ব্যবস্থা হলো এই লঞ্চ সার্ভিস। সুযোগ সুবিধামত অবশ্যই এই নদী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। পটুয়াখালীতে গতবারের মত এবারও স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল কাদের তালুকদার ও তাঁর সঙ্গীরা লঞ্চ ঘাটে ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর সফর সঙ্গীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। পটুয়াখালীস্থ আহমদীয়া মসজিদের পাশেই শিকদার বাড়ী।

পটুয়াখালী মসজিদ নির্মাণের পর অন্যান্যদের মাঝে জনাব ন্যাশনাল আমীর (১৯৯৯)।

খাকদানের চতুর্দশ বার্ষিক জলসার একটি দৃশ্য।

যথারীতি আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করেন **জনাব শ. ম. দেলাওয়ার হোসেন দিলীপ** ও তাঁর পরিবার। দিলীপ সাহেবের মা একজন নিষ্ঠাবান লাজনা সদস্যা। তাঁর কাছ থেকেই দিলীপ সাহেব ও তাঁর গোটা পরিবার অতিথি আপ্যায়ন শিখেছেন। এবার বিভিন্ন সদস্যদের বাড়ীতে দাওয়াতের ব্যবস্থা ছিল। এই নতুন রীতিটা আমার ভাল লেগেছে। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের চেনা যায় অন্যদিকে মেহমানদারীর বিষয়টা পরিবার কেন্দ্রিক না থেকে জামাতীরূপ লাভ করে। পটুয়াখালীর কর্মীদের মাঝে **মোয়াল্লেম জনাব তৌহিদ, সোবহান, ফিরোজ, সোহাগ ও ইলিয়াসের** নাম উল্লেখযোগ্য।

২৪ তারিখ **খাকদানের** জুমুআর নামায খোলা মাঠে শামিয়ানার নীচে মাইকযোগে আদায় করার সুযোগ হয়। পাড়ার সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের জুমুআর নামায প্রত্যক্ষ করেন। এবার ঢাকা থেকে অনেক আহমদী, বিশেষ করে মীরপুরের অনেক নিষ্ঠাবান আহমদী এই জলসায় যোগ দেন। সন্ধ্যার পর জলসা আরম্ভ হয়। এটি ছিল খাকদানের সপ্তদশ বার্ষিক জলসা। জলসা শেষে গভীর রাত পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান ও শেষে বয়াত হয়। খাকদানে আল্লাহ্‌র ফযলে জামাতী কার্যক্রম খুব দ্রুত বাড়ছে। যুবক প্রেসিডেন্ট জনাব লুৎফর রহমানের সুন্দর ব্যবহার খুবই হৃদয়-গ্রাহী। এর সাথে খাকদান পরিদর্শন আরও স্মরণীয় হয় **জনাব ফজলুল করীম আকন্দের** মত প্রবীণদের কারণে। এই 'বুড়ো' এত মজার একটা মানুষ যা বলে শেষ করা যাবে না। যাকেই ভালবাসেন তার সাথেই ঝগড়া বাঁধান। নেক কাজে নিজের বেয়াই জনাব আব্দুর রাজ্জাক মৃধার সাথেও কয়েকবার প্রতিযোগিতা করেছেন আবার বিবাদও করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যখনই জামাতের ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত প্রদান করে তখন এই বুড়োসহ সবাই মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নেন আর পূর্ণ আনুগত্য করেন। যার সাথেই 'বুড়ো' ফজলুল করীম আকন্দের ভাব হবে নির্ঘাত 'বুড়োটা' তার সাথে 'ঝগড়া' বাঁধাবেই। আমার সৌভাগ্য এই বুযর্গের সাথে আমার নিয়মিত ঝগড়া হয়। বর্তমানে **ফজলুল করীম আকন্দ, আব্দুর রাজ্জাক মৃধা, সাইদুল হক মৃধা, মোতাহার মৃধা, মাষ্টার আলী আহমদ, নাসির মৃধা, বারেক মাষ্টার** ও অন্যান্য প্রবীণদের সাথে নতুন যোগ দিয়েছেন ফজলুল করীম আকন্দ সাহেবের ছোট ভাই জনাব শামসুল হক আকন্দ। ইনি নতুন আহমদী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কৃপায় অনেক কুরবানী পরিবেশন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা এই প্রবীণদের দীর্ঘস্থায়ী করুন (আমীন)। নবীনদের মধ্যে সর্বজনাব **লুৎফুর রহমান, মাষ্টার জালাল, আব্দুর রাজ্জাক (সেক্রেটারী মাল), আমানুল্লাহ্, কামাল, মজনু, তসলিম, জুয়েল ও তার ছোট ভাই, মাসুদ ও তার ভাই** উল্লেখযোগ্য। কর্মীদের মাঝে কারও নাম বাদ পড়ে থাকলে তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

কুকুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঃ কুকুয়া একটি ইউনিয়ন সদর। বর্তমানে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ চোখে পড়ে। এই ইউনিয়নের এক কালে চেয়ারম্যান ছিলেন **সাহেব বাড়ীর** কৃতী সন্তান **জনাব আব্দুল বারেক তালুকদার**। তাঁর সময়ে এই এলাকায় অনেক কাজ হয়েছিল। এই অঞ্চলে ইঁনিই প্রথম আহমদী। অতি স্পষ্টভাষী সৎ মানবদরদী মানুষ হিসাবে আজও এলাকার কিংবদন্তী পুরুষ এই বারেক তালুকদার (মেঝ সাহেব)। এই বুযর্গ বর্তমানে রাবওয়ায় বসবাস করেন। এখন তিনি রাবওয়ার ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে হোমিও

'৯৭-এ কুকুয়া আহমদীয়া মসজিদের সামনে। বর্তমানে এখানে নতুন বড় মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

১৯৮৯ সনে কৃষ্ণনগরে। মাষ্টার আলী আহমদের বাড়ীর আঙ্গিণায়। মরুহম খন্দকার সালাহউদ্দিন সাহেবকেও দেখা যাচ্ছে।

চিকিৎসকের গুরু দায়িত্ব অতীব নিষ্ঠা ও সুখ্যাতির সাথে পালন করে যাচ্ছেন। জামেয়া আহমদীয়ায় ছাত্র থাকা কালে দীর্ঘ আট বছর এই বুযর্গের সাহচর্য লাভ করার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি তাঁর গোল-বাজারস্থ বাসায় কয়েকবার ডেকে নিয়ে মাছ-ভাত খাইয়েছেন, অনেক আলাপের সুযোগও হয়েছে, কিন্ত কোনদিন তিনি মুখ ফুটে নিজের ঐতিহ্যবাহী বংশের, স্মরণীয় কর্মকান্ডের বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলেন নি। দেশে ফিরে প্রথম যখন '৮৯তে কুকুয়া গিয়ে তাঁর স্মরণীয় মানব সেবার কথা জানতে পারলাম, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আমি আশা করি, তিনি একবার দেশে এসে তাঁর গুণমুগ্ধ জনগণকে অন্ততঃ একবার দেখা দিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী তাঁর বড় ছেলে আব্দুল খালেক সাহেবের বড় দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি।

এই কুকুয়াতে টিনের ভাঙ্গা মসজিদের স্থলে নতুন সেমি-পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বেশ বড় আকারের এই মসজিদটির নির্মাণ কাজের টুক টাক কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করি। জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব ২৫ এ মার্চ মাগরিবের নামাযের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই জামাতের প্রবীণদের মধ্যে রয়েছেন সর্বজনাব মেম্বার রুস্তম খলীফা, কাঞ্চন মেম্বার ও আলাউদ্দীন তালুকদার। নবীনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মী হলেন, সাহেব বাড়ীর বুলবুল, আসলাম ও রুস্তম খলীফার ছেলে জনাব এম, এ হান্নান (সোহরাব) আর তাঁর ছোট ভাই। এবার কুকুয়া জামাতে দ্বাদশ বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে মার্চ। এ জলসায় গভীর রাত পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে তিনজন বয়াত হন। এদের একজন হলেন কামেল পাশ আলেম।

কুকুয়া ইউনিয়নের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি**। আমাদের মসজিদের পাশেই মরহুম ক্বারী আফাজউদ্দীন সাহেবের দরগাহ বা মাজার। তাদের সাথে ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুশীলনে আমাদের মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীসুলভ সুন্দর ঘনিষ্ঠ আচরণ আর সহযোগিতার কোনো অভাব নেই। বর্তমানে যারা পীরজাদা আছেন তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন **জনাব গোলাম সারওয়ার** আর অপরজন হলেন **জনাব আবুল কালাম**। দু'জনই ডিগ্রীধারী আলেম আর মারেফতী তরীকার অনুসারী। এসত্ত্বেও আহমদীয়া তরীকা সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রাখেন ও প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত করেন। মহান আল্লাহ্ তাদের এই নেক কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দিন (আমীন)। প্রতিবার তাঁরা আমাদের জলসায় উপস্থিত থাকেন। এবারও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

কুকুয়া জলসার পর জনাব ন্যাশনাল আমীর পটুয়াখালী হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। কাফেলার একাংশ কৃষ্ণনগরে ও কাউনিয়ায় তবলীগি জলসা করার জন্য রয়ে যায়।

আল্লাহ্তাআলার অশেষ দয়ায় খাকদান জামাতের কৃষ্ণনগর হালকায় জামাতের লোক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে গত বছর জরুরী ভিত্তিতে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে। এবার ২৫ মার্চ খাকদান থেকে কুকুয়া যাবার পথে জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব কয়েক ঘন্টার জন্য কৃষ্ণনগর হালকা পরিদর্শন করেন। খাকদান আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এটি নতুন হালকা।এখানে নির্মিত হয়েছে একটি সুন্দর টিনের মসজিদ। এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে কৃষ্ণনগরের প্রভাবশালী মুনশী বাড়ীর প্রবেশ পথের ধারে। গত এক দেড় বছরে এই এলাকায় অনেকে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছেন। কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, **মাষ্টার আলী আহমদ, শাহজাহান মিঞা, আব্দুর রব মেম্বার, আবতাব আলী মাতবর, আক্কাস মিঞা, নাসের আহমদ আনসারী**। পর্দার আড়ালে জামাতের সেবায় নিবেদিত বেগম আলী আহমদ ও তাঁর মেয়ে মিসেস বিলকিস বেগম। ছিমছাম সুন্দর পরিপাটি একটি পরিবেশে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দর আহমদীয়া সমাজ। আল্লাহ্তাআলা সকল কর্মীদের উত্তম প্রতিদান দিন (আমীন)।

পটুয়াখালী জামাতের একটি নতুন শাখা **কাউনিয়া**, বেতাগী থানার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের একজন বুযর্গ পঞ্চাশের দশকে আহমদীয়াত গ্রহণ করলেও তা তখন প্রসার লাভ করে নি। ১৯৯৩ সনে কাউনিয়া গ্রামের স্কুল মাষ্টার ওহাব সাহেবের আহমদীয়ত গ্রহণের মাধ্যমে এখানে আহমদীয়তের একটি নতুন সূচনা ঘটে। ওহাব মাষ্টারের মাধ্যমে তাঁর পরিবার, তাঁর সব ভাই ও রব মাষ্টার সবাই আহমদীয়া খিলাফতের নিকট বয়াত করেন। ১৯৯৯ সনে এ অঞ্চলে অনেক শিক্ষিত মানুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের দাওয়াত লাভ করেন ও যাচাইপূর্বক তাঁকে গ্রহণ করেন। এই হালকায় নবজাগরণের সাথে সাথে নির্মিত হয় একটি টিনের মসজিদ। অনেক নিষ্ঠাবান আহমদীরা কুরবানী করেছেন এই মসজিদ নির্মাণে। ওহাব মাষ্টারের বড় ছেলে দেহাতী মোয়াল্লেম **ইদ্রিস** কাঠের কাজ জানেন। তিনি নিজ হাতে মসজিদের সমস্ত কাঠের কাজ করেছেন। আল্লাহ্তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। (আমীন)। ওহাব মাষ্টারের ছোট

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসায় মোহতারম ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করি। আজকে আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমাদের খুবই আশংকা ছিল এই কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ একদিকে চলছে আমরা আপনাদেরকে এই টাইমের ভেতরে জায়গা করে বসাতে পারব কি-না। এই জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করি। আর বিশেষ করে এজন্যে যে, আমাদের ভাইয়েরা হরতালের ভিতর দিয়েও এখানে এসে উপস্থিত হতে পেরেছেন। দুইদিন হরতালের কারণে অনেক ভাই এসে পৌঁছুতেও পারেন নি। এবং আপনারা যে এত কষ্ট করে এসেছেন, এই জন্যও আমি আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি ভাইদেরকে বলব, আপনারা এই তিনটা দিনকে আপনাদের আধ্যাত্মিকতার উন্নতির কাজে লাগান। প্রোগ্রামগুলো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং যিক্‌রে ইলাহিয়াতে রত থাকুন। এই তিনদিন যেন আমার ভাইদের জন্য একটা আধ্যাত্মিক গোসলে পরিণত হয়। তাহলেই আমাদের জলসা স্বার্থক হবে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি লগ্নে। একদিকে চলছে চরম বিরোধিতা, অপরদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের বারিধারা।

আপনারা জানেন ১৯৯৯ইং সনের ৭ই জানুয়ারী থেকে আমাদের জামাতের উপর মোখালেফাতের একটা ধারা চলে আসছে। কুষ্টিয়া জেলায় নাসেরাবাদ জামাতের মসজিদ রমযান মাসে মৌলবাদী চক্র ও সন্ত্রাসীর দল মিলিত হয়ে ভেঙ্গে দেয়। ওখানকার ডিশ, টি.ভি এবং আহমদীদের বাড়ী-ঘর পর্যন্ত লুটপাট করে এবং মিথ্যা মামলায় আমাদের ভাইদেরকে জর্জরিত করে। এখনও তার প্রতিক্রিয়া চলছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে এই নাসেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেবকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। তার হাতের রগগুলো কেটে দেয়। এখনও তিনি হাসপাতালে আছেন। আপনারা এই জামাতের জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন।

বক্‌শীগঞ্জ জামাতের উপরেও ১৯৯৯ সনে কয়েকবার হামলা হয়েছে। আপনারা জানেন ৮ই অক্টোবর খুলনা মসজিদে বোমা হামলা হয়। এবং বোমাতে আক্রান্ত হয়ে আমাদের সাত ভাই "শহীদ" হন। এদের মধ্যে আমাদের শহীদ ডাক্তার এম. এ. মাজেদ সাহেব, শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব, শহীদ- জি. এম. মুহিব্বুল্লাহ্ সাহেব, শহীদ নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব, শহীদ জি. এম. আকবর হোসেন সাহেব, শহীদ সোবাহান মোড়ল সাহেব এবং শহীদ ডাঃ মুস্তাজুদ্দীন গাজী সাহেব রয়েছেন। ওখানে অনেক ভাই আহত হন। এখনও আহত ভাইদের চিকিৎসা চলছে। ৮ তারিখে যখন হামলা হ'ল এবং আহত ভাইদেরকে নিয়ে আসা শুরু হ'ল তখন ১০ তারিখে ঢাকায় দারুত তবলীগ মসজিদে বোমা পাওয়া গেল। বিরোধিরা চাচ্ছিল একটা চক্রান্ত করার জন্য। আল্লাহ্‌র ফযলে আল্লাহ্‌র খাস রহমতে তাদের চক্রান্ত বিফল হয়– ঢাকাতে বোমা ফোটার আগেই ধরা পড়ে যায়। তখন আমাদের ভাইয়েরা বিশেষ করে খোদ্দাম ভাইয়েরা যেভাবে এই আহত ভাইদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে তা অতুলনীয়। খোদ্দামরা ডে-নাইট তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সেবার কাজে ব্যস্ত ছিল, এবং আমি বিশেষ করে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে চাই, এই খোদ্দামদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আমাদের নায়েব কায়েদ মারুফ আহমদ, আল্লাহ্ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তার প্রতি টর্চারিংও হয়। কিন্তু সে পিছ-পা হয়নি। তারা কাজ করেছে এবং এখানকার খোদ্দামরা তখন যে সার্ভিস দিয়েছে রিয়েলী তা প্রশংসনীয়। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তাদেরকে আরও সেবা করার তৌফীক দান করেন।

আপনারা জানেন, নাটোরের তেবাড়ীয়া জামাতের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। মসজিদ তারা দখল করে নিয়েছিল, কিছুদিন তাদের হাতেও ছিল। কিন্তু আমাদের নাটোরের ভাইয়েরা বারবার মার খেয়েও পিছ-পা হয়নি। এবং তাদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত তাদের উপর নাযেল হয় এবং তারা সেই মসজিদ ফিরে পান। এটাও আহমদীয়তের একটা জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ যে, এই জামাত কত আনুগত্যশীল এবং মানুষ এগুলো দেখে বুঝতে পারে যে, তারা সকলে মিলে একটিই দল। রসূলে করীম (সঃ) বলেছিলেন ৭৩ ফিরকার মধ্যে জান্নাতবাসী যে একদল সেই দলটা হবে আমার এবং আমার সাহাবীদের নমুনাস্বরূপ।

এখন এই বিশ্বের চতুর্দিকে তাকালে কারা সেই দল, কারা মার খাচ্ছে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের রাস্তায়? এত ত্যাগ স্বীকার সবার দ্বারা হয় না। এলাহী জামাতের দ্বারাই এইটা সম্ভব। এই ঐশী জামাতের কুরবানীর ফলে আজ বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ইসলাম এবং আহমদীয়তের ঝান্ডা উড়ছে। সারা বিশ্বের মানুষ মুসলমানদেরকে মনে করে এটা একটা সন্ত্রাসী জাত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদী মুসলমানদের তারা মনে করে একটা আদর্শ জামাত। আহমদীদেরকে যখন বাইরে ইসলাম প্রচার করতে যেতে হয় তখন তাদেরকে বুঝাতে হয় যে, প্রকৃত ইসলাম এই। তারা বলেন, না ইসলাম তো সন্ত্রাসী ধর্ম যেখানে ইসলাম যেখানে মুসলমান সেখাইে মারামারি, কাটাকাটি ও সন্ত্রাস। আমাদের এ দুর্নাম মোচন করতে হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে সারা বিশ্বে ইসলামের আসল নমুনা পেশ করে বর্তমানে ১৬০টি দেশে আহমদীয়ত প্রচার প্রসার লাভ করছে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় আবার মজার বিষয়ও। কারণ, যারা আমাদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দেয় অমুসলমান বলে ডিক্লার দিতে সংগ্রাম করে। তারাই আবার আমাদের মসজিদ, যেমন– নরওয়ের, অষ্ট্রেলিয়ার মসজিদের ছবি দিয়ে নিজেদের মসজিদ বলে প্রচার করছে, ইনকিলাব পত্রিকায় আপনারা দেখবেন। সঠিক খবর সরবরাহ করেছি। এখন দেখছি আল্লাহ্‌র ঘর নিয়াও বিভ্রান্তির চেষ্টা করা হচ্ছে। মসজিদ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তবে যাদের কুরবানীতে ও তত্ত্বাবধানে হচ্ছে তা বলাই তো ইনসাফ। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলছেন, "অবিশ্বাসীরাও কখনও কখনও চায়, হায় ! তারাও যদি আত্ম সমর্পণকারী হতে পারত"। এইটার নমুনা দেখেন। এরা যেমন

একদিকে মসজিদ কেড়ে তাদের নামে চালিয়ে যাচ্ছে এটা হ'ল তাদের ক্রেডিট, আবার তারা ব্যক্তিত্বের বেলায়ও এরকমই করে। তারা স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান এবং প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালামকে বলেন যে, তারা মুসলমান। আর যখন দেখেন যে, এরা কাদিয়ানী তখনই আবার উল্টা বলে। সুতরাং এটা কেন হয়েছে ? এটার একমাত্র কারণ এটা ঐশী জামাতের নিদর্শন। এরকম সন্তান পয়দা একমাত্র ঐশী জামাত-ই করতে পাবে। সবার দ্বারা হয় না। প্রাসঙ্গিক কথার শেষে বিরোধিতার কথা বলছি।

ঐশী জামাতের বিরোধিতা একটা চিরন্তন নিয়ম। এই বিরোধিতা আমাদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ। আমি ভাইদেরকে বলি দেখ, যদি আহমদীয়তকে অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে বিফল করতে চাও তাহলে তোমরা সবাই তার বিরোধিতা ছেড়ে দাও। তাহলে তোমরা দেখতে পারবে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতার জ্বলন্ত একটা প্রমাণ হ'ল সম-সাময়িক উলামারা তাঁর বিরোধিতা করবে। সুতরাং দেখেন এই বিরোধিতা আমাদের হবেই। আমার মনে পড়েছে একদিন জেনারেল আমজাদ সাহেব বলেছিলেন। গাড়ী কিনলে যেটা একসিডেন্ট হবে এটা কোন ব্যাপার নয়। আশ্চর্যের বিষয়ই হবে যদি একসিডেন্ট না হয়। আহমদী হলেই বিরোধিতা হবে; মুখালেফাত হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যদি না হয় মনে করবেন যে, এর মধ্যে কোন একটা মাহাত্ম্য রয়ে গেছে। সুতরাং আহমদীয়তের বিরোধিতা হবেই। এটা আহমদীয়তের সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। আমি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রগতিশীল বাংলাদেশের সাংবাদিকদের এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর। আপনি দেখেন, দুটো মৌলবাদী পত্রিকা ছাড়া সমস্ত পেপার, সাংবাদিকরা সত্যের প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে এবং আমাদের বর্তমান হুযূর (আইঃ) এই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দোয়ার মেসেজ (বাণী) পাঠিয়েছেন। কারণ তারা সৎ সাহসী এই জন্য।

আমি সংবাদ মাধ্যমগুলো যারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করার মাধ্যমে সমাজকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের বিবেক এদেশের বুদ্ধি-জীবীদের সচেতন কলাম লেখকদের যাঁদের বক্তব্য ও লেখনী সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করছে। আমরা দেশের স্বার্থে সমাজের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারের কাছে এই সব আক্রমণের ঘটনা সুষ্ঠু ও পূর্ণ তদন্তের শেষে দোষী ব্যক্তি ও সংগঠনকে খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাছি। আমাদের খলীফা বলেছেন, সরকারের কাছে, মানুষের কাছে বা দুনিয়াবী কোর্টে কেস দাখিল করে আমাদের কোন ফায়দা হবে না। আমাদের প্রিয় খলীফা বলেছেন যে, আল্লাহ্র কোর্টে কেস দাখিল কর। মানুষের কাছে কেস দাখিল করে কোন ফায়দা হবে না। সুতরাং আমি ভাইদের বলব, আপনারা আল্লাহ্র কোর্টে কেস ফাইল করেন। তার অর্থ আপনারা বেশী বেশী করে দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি লাভ করেন এবং আল্লাহ্ আমাদের ডাকে সাড়া দেন। একদিকে দেশের বিভিন্ন অংশে পরিকল্পিত বিরোধিতা চলছে। অপরদিকে মহান আল্লাহ্ আমাদের একের পর এক উন্নতি ও সাফল্য দান করছেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ, এবারকার এই ৭৬তম সালানা জলসা। গতবার আমরা ডায়মন্ড জুবিলী ৭৫ তম সালানা জলসা করেছি। এইবার আমরা ৭৬তম সালানা জলসা করতে যাচ্ছি। এই ৭৬ বৎসর পর্যন্ত খুব কম অর্গানাইজেশন আছে, যারা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়তের বিজয় শতাব্দী শুরু হয়েছে। আপনারা জানেন, আহমদীয়তের এখন একশ' দশ বৎসর পার হচ্ছে। কোন মিথ্যাবাদীর কর্ম একশ' বৎসর জীবিত থাকে না। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে ওয়াদা করেছেন, "যারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যাচারিতা করবে তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। তাদের জীবন শিরা কর্তন করবেন।" সুতরাং এই একশ'ই দশ বৎসর কোন মিথ্যাবাদী জামাতটিকে থাকতে পারে না। আমাদের একশ' বছর গেছে (নিজেদের পরিচয় করাতে)। ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "প্রথম শতাব্দী হবে ইনট্রোডাকশনে দ্বিতীয় শতাব্দী হবে বিজয়ী শতাব্দী। এর নমুনা আপনারা দেখছেন। হুযূর যখন আলমী বয়াতের সিস্টেম চালু করেছেন। প্রথম বৎসর এক লক্ষ লোক বয়াত করে। তারপরের বৎসর দুই লাখ পার হয়ে যায়। এরকম প্রত্যেক বৎসর পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ বয়াত হচ্ছে। গত বৎসর এক কোটির উপরে সারা বিশ্বে নতুন মানুষ বয়াত করেছে। এ বৎসর আল্লাহ্র ফযলে দুই কোটির উপরে বয়াত গ্রহণ করবে, ইন্শাআল্লাহ্। এটা কিসের লক্ষণ ? এটা কি মানুষ বলতে পারে ? কিন্তু যে আল্লাহ্র খলীফা তিনিই বলতে পারেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র ফযলে ডবল হবে এবং আল্লাহ্র খলীফা যখন বলে তখন আল্লাহ্র ফেরেশ্তারা কাজ করে থাকেন। আমরা তো উছিলা মাত্র। সুতরাং এই সালানা জলসা ৭৬তম সালানা জলসার সকল বাধা-বিপত্তি দেখে দুই দিনের স্ট্রাইক ছিলো। তারপরেও মানুষ হাজির হয়ে গেছে। বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও খোদা ও রসূলের প্রেমিকরা উপস্থিত হয়েছেন। আরও এসেছেন সত্যের সন্ধানী শত শত আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা। এখানে আমাদের অনেক জেরে তবলীগ ও আহমদী ভাইয়েরা এসেছেন, তারাও জানতে এসেছেন। 'আল্লাহ্ তাদেরকে সত্য গ্রহণ করার তওফীক দান করুন' আমি দোয়া করি। এই বাংলাদেশের প্রথম সালানা জলসা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। আমার বাড়ীও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। আমরা ছোট থাকতে শুনেছি। আমার জন্মের আগে, কিন্তু তখন লোক হয়েছিল গুটি কয়েকজন; আজ এখন দেখেন আমরা জায়গা দিতে পারি না। ইমাম মাহ্দী (আঃ) ঐযুগে বলেছিলেন, "তোমরা ঘর বড় কর।" আমরা গতকাল ঘর একটু বড় করলাম, মনে করলাম যে, বোধ হয় কয়েক বৎসর চলবে। আমার তো মনে হয় এবার যে বাড়িয়েছি এর পরেও আগামী বছর আরও বেশী লোক হবে। যেহেতু গ্রামে এখন ইরি ধান লাগানোর সময় এইসব কারণে অনেকে আসতে পারে নি, স্ট্রাইকের কারণেও আসতে পারেনি। আগামী বছর এই জায়গাতে সংকুলান হবে কি-না সন্দেহ। সুতরাং এই হ'ল মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন। তিনি একশ' দশ বছর আগে বলেছিলেন, দেখ, 'তোমরা ঘর বড় কর'। আপনারা দেখতেছেন এই যে আল্লাহ্র নিদর্শন এই যে, তবলীগ কেন্দ্রটি আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। এইটা একটা বিরাট কাজ। আমি ভাইদেরকে বলব আপনারা এই খাতে বেশী বেশী করে চাঁদা দিন যাতে আমরা এ কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করতে পারি।

পরিশেষে আমি সকলের কাছে জলসার সফলতার জন্যে দোয়ার আবেদন রেখে আমার উদ্বোধনী বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ❑

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস্ (মরহুম)

(৫ম কিস্তি)

জাতিসংঘের এই কমিশন তো এ প্রস্তাব পাশ করেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস অবলম্বন করার এবং স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু কতই না দুঃখের বিষয় যে, যখন এই স্বাধীনতার বিষয়টি তৃতীয় কমিটির সম্মুখে উপস্থাপন করা হলো তখন ঐ কমিশনের পাকিস্তানী প্রতিনিধি এবং আফগানিস্তান, সৌদি আরব ও ইয়ামেনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ প্যারাগ্রাফটির, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিরোধিতা করে যে, একজন মুসলমানের জন্যে ধর্মান্তরিত হওয়া অসম্ভব বিষয়। এর ওপরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব মানবাধিকারের শেষ বিতর্কে সম্মিলিত জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে ইষ্টার এজেন্সীর সংবাদ অনুযায়ী ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন ঃ

"যখন এ বিষয়টি তৃতীয় কমিটির সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিলো তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধির একটি প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়– যার মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টির অনুমোদন ছিলো। আমাদের এর ওপরে খুবই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, যদি এ বিষয়টি সুস্পষ্ট না করা হয় তাহলে খুব সম্ভব যে, পাকিস্তানের ব্যাপারে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। এজন্যে আমার ইচ্ছা যে, আমি পাকিস্তানের প্রতিনিধির অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে দিই যেন এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকার ভুল ধারণার অবকাশ না থাকে। পাকিস্তান কোন দলীল প্রমাণ ও কোন শর্ত ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থনকারী। আর এ দফার মধ্যে যতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে পাকিস্তান উহার সমর্থন করে।

যে পর্যন্ত আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে এ সমস্যাটি কেবল নীতিগতভাবে সমস্যা নয়। এ সমস্যা এমন একটি সমস্যা যার সম্পর্ক আমাদের ধর্ম ইসলামের সম্মানের সাথে সংবদ্ধ। এজন্যে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে আমরা এ বিষয়ে কোন প্রকার ভুল ত্রুটির অবকাশ রাখতে চাই না। বিশেষভাবে যখন কিনা আমাদের প্রতিনিধি ইহা মনে করেছেন যে, তিনি কমিটির সম্মুখে সঠিক রায় প্রদান করেছেন।

চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান বলেন যে, সবচে' অধিক পূর্ণ-বিশ্বাস ও সবচে' অধিক প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য ইসলামী শিক্ষার মানদন্ড হলো কুরআন শরীফ। মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন স্বয়ং খোদাতাআলার কথা। তিনি বলেছেন যে, কুরআন ঈমান শিখিয়েছে। কিন্তু উহার সাথে সাথে কুরআন ইহাও আদেশ প্রদান করেছে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মের সম্পর্ক মনের সাথে। আর এ কথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, মনের ওপরে কোন প্রকার জোর করা যেতে পারে না। যদি তোমরা কোন ব্যক্তির মনের ওপরে বল প্রয়োগ করতে চেষ্টা করো তাহলে তোমরা তো কেবল ঐ ব্যক্তিকে মুনাফিক (কপট) বানাতে কৃতিত্ব অর্জন করবে।

কুরআন করীমে হেদায়াতের পথ একবারেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পথ ভুল-ত্রুটি ও ভ্রষ্টকারী পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্যে মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, যার ওপরে সে বিশ্বাস আনে সে উহাকে অবলম্বন করতে পারে। আর যার ওপরে তার বিশ্বাস হয় না উহাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে ব্যক্তি নিতে চায় সে যেন ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তির বিশ্বাস হয় না সে যেন ঈমান না আনে। কুরআন মাজীদের যে কোন অংশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন না কেন উহার এক প্রান্ত থেকে নিয়ে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যদি পাঠ করেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, কুরআনে হাকিমে মুনাফিকদের প্রতি খুবই নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, শক্তি প্রয়োগের অধিকারের দাবী করা খুবই অসমীচীন এবং অন্যদের অধিকারসমূহকে খর্ব করাও অসমীচীন। যেসব লোক এসব শর্তের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের প্রকাশ ঘটায় তারা তা কেবল ভীতি ও ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে করে।

যতটা ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ইসলাম যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্ত মনের অধিকারী হওয়ার অনুমতি দিয়েছে সে প্রসঙ্গে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর ইসলামী শিক্ষা সব রকমের শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতার উর্ধ্বে। অতএব পাকিস্তান এ শর্তের সমর্থনের জন্যে আনন্দিত। কেননা, এ শর্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে না" (আল্ ফযল, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

আল্লাহ্তাআলা চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান সাহেবকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করে জাতিসংঘের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে ইসলামের শির উন্নীত করেছেন। প্রকাশ্য ভাষায় তাদের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা যা কিনা বিংশ শতাব্দীতে মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তা ঘোষণা করে দিয়েছিলো।

মুসলমানদের ইহুদী ও খৃষ্টান সদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

এক যুগ এমন ছিলো যে, ইসলামের অনুসারীরা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার জন্যে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিলেন। বহু কঠোর ও শক্তিশালী শত্রুদের সম্মুখে বুক পেতে দিতে পিছ পা হন নি। প্রিয় প্রাণের মহান কুরবানী দিতে থাকেন। **কাতিলুহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতনাতুন ওয়া ইয়াকূনাদ্দীনু কুল্লুহু লিল্লাহ্** – অনুযায়ী কাজ করতে থেকেছেন। ক্লান্ত হন নি বা থেমে যান নি। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিৎনা দূরীভূত হয়ে আল্লাহ্র জন্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে। এবং **লা ইকরাহা ফিদ্দীন**-এর পবিত্র ঘোষণা ঐশী পরিবেশে প্রতিধ্বনিত না হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মে কোন শক্তি প্রয়োগ নেই। যে ব্যক্তি ধর্ম পালন করতে চায় তা করতে পারে। শক্তিশালী মানুষের কোন অধিকার নেই যে, সে কাউকে ধর্ম পালনের জন্যে বা পরিত্যাগ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আর এক যুগ এমন এসেছে যে, ঐ ইসলামের দিকে নিজেকে নিজে আরোপকারী যাদের প্রাথমিক অনুসারীরা ধর্মীয় স্বাধীনতার চারাকে রক্ত দ্বারা সিঞ্চন করেছিলো। ধর্ম গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে চিন্তা ধারা প্রকাশ করার স্বাধীনতা অন্যকে দেবার জন্যে প্রস্তুত নয়। এর ওপরে যতই দুঃখ প্রকাশ করা হোক না কেন তা কম। কিন্তু ইহা ঐ বিষয় যা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করার ছিলো। কেননা, আল্লাহ্তাআলার পবিত্র রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে বলেছিলেন ঃ

তোমরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর রীতি-নীতি অবলম্বন করবে এবং বিশেষ করে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পায়ে পায়ে চলবে (সহী বুখারী, ২য় খন্ড, কিতাব বা'দাল খালক)।

প্রকৃত ঘটনা এ ভবিষ্যদ্বাণীকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত

হচ্ছে। আমি দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি যদ্বারা এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে।

মুরতাদের হত্যার বৈধতা সম্বন্ধে আহরারদের দলীল

আহরারদের পক্ষ থেকে মুরতাদের (যারা ধর্মান্তরিত বা ধর্ম থেকে ফিরে যায়) হত্যার বৈধতা সম্পর্কে একটি দলীল ইহা উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

"যখন কোন মানুষ কোন দেশে নিরাপত্তার আশ্রয় লাভ করে এবং কোন দেশের সীমানার মধ্যে পৌর সুবিধাদি ভোগ করে তখন তার ওপরে ঐ দেশের আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরী হবে। আর এর প্রতি বিদ্রোহের শাস্তি কেবল গুলিই হতে পারে। ..... এ অবস্থাই ঐ ব্যক্তির যে একবার শরীক বিহীন এক খোদা এবং তাঁর শেষ সত্যবাদী রসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে ঈমান আনার পরে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আনুগত্যের সীমার মধ্যে চলে না আসে– তার ওপরে শক্তি প্রয়োগ নেই। ধর্মে বল প্রয়োগ না হওয়ার ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু যখনই সে নিজেকে নিজে স্বেচ্ছায় ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয় তখন সে উহাকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে জীবিত থাকার যোগ্য নয়" (আযাদ, ১৩ অক্টোবর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ লিখক, কাযী যাহিদুল হুসায়েনী)।

এ প্রবন্ধের লেখক ইসলাম থেকে কেবল ফিরে যাওয়াকে খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তেমনই বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছে যেভাবে কোন পার্থিব বাদশাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ঐ উভয় বিদ্রোহের শাস্তি হত্যা নির্ধারণ করেছে এবং ইহা অবিকল সেই দৃষ্টিভঙ্গি যাকিনা খৃষ্টান পাদ্রীরা নিজেদের শক্তি ও শাসনের সময়ে অবিশ্বাসী ও মুরতাদদের জন্যে সাব্যস্ত করেছিলো ঃ

Innocent III assimilated the crime of high treason against God to that of High treason against the temporal Rules and admitted all the terrible consequences of this assimilation" (Encyclopaedia Britanica 11th edition under the word. 'Inquisition') অর্থাৎ ইন্নোসেন্ট ৩য় খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে পার্থিব বাদশাহ্‌দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সদৃশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ সাদৃশ্যের কারণে যে ভয়ানক ফলাফল সৃষ্টি হতে পারতো তা স্বীকার করেছেন। যার কারণে ধর্মীয় মত-বিরোধের ভিত্তিতে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

এখন দেখা উচিত যে, আহরাররা যে উপরোক্ত দলিল উপস্থাপন করেছে উহা হুবহু উহাই কিনা যে ধর্মীয় বিরোধের কারণে শাস্তি দেবার সময়ে পাদ্রীরা উপস্থাপন করেছিলো। কিন্তু কেবল ইরতেদাদ অর্থাৎ কোন ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করে পরিত্যাগ করা খোদাতাআলার বিরুদ্ধে অবশ্যই এমন বিদ্রোহ নয় যেভাবে কোন পার্থিব রাজা বাদশাহ্‌র আইন-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়ে থাকে। উভয় প্রকার বিদ্রোহকে এক প্রকারেরই বিদ্রোহ নির্ধারণ করা যে, উভয়ের জন্যে একই প্রকারের শাস্তি প্রস্তাব করা কেয়াস মাআল ফারিক অর্থাৎ মতভেদসহ অনুসিদ্ধান্ত, যা কোন প্রকারে সঠিক হতে পারে না।

বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তো স্বীয় শাসন-ক্ষমতা হারানোর ভয় থাকে। তারপর বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, যদি বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা না হয় তাহলে সে সরকারের শাসন-ক্ষমতাকে উল্টিয়ে দেবে। কিন্তু কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তন দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলারও কি এই আশঙ্কা হতে পারে যে, আমার শাসন-ক্ষমতা চলে যেতে থাকবে? তা কখনও হতে পারে না। আর এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বাদশাহ্‌র নিয়ম-কানুনের বিদ্রোহের শাস্তির ওপরে অনুমান করে মুরতাদের ঐ শাস্তি মনে করা একেবারেই অযথা ও বাতিলযোগ্য। আর এর অযথাও বাতিলযোগ্য হওয়া এতই সুস্পষ্ট যে, তাদের ওলামা ফাযেলা ওকালা–

আহরার ব্যতিরেকে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সহজে ইহা উপলব্ধি করতে পারে।

আহরার বুদ্ধিজীবীরা তো এভাবে চিৎকার করে যে, যেভাবে কোন বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের শাস্তি হত্যা তেমনিভাবে আল্লাহ্‌তাআলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের শাস্তিও হত্যা। এতদ্‌দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ্‌ এ ভয়ে বিদ্রোহীকে হত্যার শাস্তি দেয় যে, যদি তাকে শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে শাসন-ক্ষমতা উল্টে দেবে। এভাবেই আল্লাহ্‌তাআলারও নাউযুবিল্লাহ্‌ ভয়ে হয়ে থাকবে যে, বিদ্রোহী আমার শাসন-ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত মূসা আলায়হেস সালামের ভাষায় বিশ্বকে এ ঘোষণা শুনিয়েছিলেন ঃ

"যদি তোমরা ও ভূপৃষ্ঠ সকল লোক অকৃজ্ঞতা করো তথাপি (আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কেননা) আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর; প্রশংসাভাজন।" (সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ৯)।

আবার বলেন, "আর যে ব্যক্তি তার গোড়ালিদ্বয়ের ওপরে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোনও ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৪৫ আয়াতাংশ)।

"এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক আছে সবাই ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মু'মিন হয়" (সূরাতু ইউনুস ঃ ১০০)।

যদি আল্লাহ্‌তাআলা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন তখন সারা বিশ্বের অধিবাসীরা ঈমান নিয়ে আসতো। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌তাআলা ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগের বিধান রাখেন নি সেক্ষেত্রে তুমি কে যে, লোকদের ঈমান নেবার ব্যাপারে বাধ্য করবে ? মুরতাদ কেবল ঐশী শাসনের বিদ্রোহী এবং ঐশী বাদশাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা বলেন যে, যখন আমি স্বয়ং ধর্মের ব্যাপারে শক্তিপ্রয়োগ পসন্দ করি না তাই আমি তোমাদেরকে ধর্মের ব্যাপারে লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করার জন্যে কি করে অনুমতি দিতে পারি ? আর ইহা সুস্পষ্ট যে, মুরতাদকে হত্যার শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা নিশ্চিতভাবে শক্তি প্রয়োগ।

মানুষ যখন সঠিক পথকে পরিহার করে তখন সে এমনই নিরর্থক কথা-বার্তা বলতে থাকে যা মান্য করার জন্যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ প্রস্তুত হতে পারে না। **লা ইকরহা ফিদ্দীন**–এর অর্থ এই বলা যে, প্রথম বার তো ধর্মে বল প্রয়োগ নেই অর্থাৎ কাউকে ইসলামে দীক্ষা প্রদান করতে গিয়ে তার ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে না বরং যদি কেউ এক বার স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পরে উহাকে পরিহার করে তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা যাবে এবং যদি সে জীবিত থাকতে চায় তাহলে উহার এই একটি পদ্ধতিই হতে পারে যে, সে তওবা করে ইসলামে সংশ্লিষ্ট থেকে যেতে পারে যেন তারা এ আয়াত থেকে এ কথটি বের করতে চায় যে, ইসলামে প্রবেশ করার জন্যে কারও ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা তো জবরদস্তি করার শামিল কিন্তু যদি কেউ ইসলাম গ্রহণের পর উহাকে পরিহার করতে চায় তখন তাকে হত্যা করে ফেলাও জবরদস্তি বলা যায় না। কার মুখে কে তালা লাগাবে ? কিন্তু কোন বুদ্ধি কি ইহা গ্রহণ করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে কারও ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা তো ধর্মীয় স্বাধীনতার অপলাপ, কিন্তু কারও ইসলাম গ্রহণ করে নেবার পরে যদি সে এতে থাকতে না চায় তাহলে তাকে বাধা দেয়া এবং বাধা দিতে গিয়ে ভয় দেখানো–ধমক দেয়া ও দুঃখ-কষ্ট দেয়া এমন কি হত্যা করে ফেলাও জবর-দস্তি নয়। এবং ইহা ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরোধীও নয়। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৪৬তম কিস্তি)

ইতোমধ্যে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন বৃহত্তর সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় যাওয়া যাক।

(ক) প্রিয় বিশ্ববাসী লও সালাম ঃ

বিশ্ববাসীকে 'সালাম' বলে অর্থাৎ সবার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শান্তি কামনা করে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে লেখা শুরু করছি। বিভিন্ন সমাজ, ধর্ম, জাতি বা দেশের মানুষের মাঝে পরস্পর দেখা সাক্ষাতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বা ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের নিয়ম-নীতি প্রচলিত আছে। এতে হৃদ্যতা ও পরিচিতি বাড়ে ও নিবিড়তর হয়। সাধারণতঃ চেনা-জানাদের মাঝে তা সীমিত থাকে।

মুসলমানরা যে দেশ বা সমাজেই থাকুক না কেন পরস্পরের সাক্ষাৎ ও বিদায়ে 'সালাম' বিনিময় করে থাকেন। ঐটা তাদের আবিষ্কৃত কোন প্রথা নয়। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনায় যাওয়ার আগে নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে নিচ্ছি। ১৯৫৮-৫৯ সালে আমেরিকায় ছিলাম। একটি সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা প্রায় তিন শতাধিক অংশগ্রহণকারী ছিলাম। তন্মধ্যে আড়াই শতাধিক ছিলো ঐ দেশের ছাত্র-ছাত্রী। বাকীরা হলেন বেশ কয়েকটি দেশের প্রশিক্ষণরত সরকারী কর্মচারী। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা স্থির করলেন বিদেশ হতে আগত টীম নেতারা ষ্টেজে উঠে অতি সংক্ষেপে নিজের দেশের ও ধর্মের নাম উল্লেখ করে, দেশ বা ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবেন অথবা আমেরিকা সম্বন্ধে তাৎপর্যবহ কিছু উল্লেখ করবেন যা তার ভাল বা খারাপ লেগেছে। নামের প্রথম অক্ষরের সিরিয়াল হিসেবে আমার ডাক পড়লো সর্বাগ্রে। ষ্টেজে উঠে বল্লুম, বৈষয়িকভাবে তোমরা (আমেরিকানরা) আমাদের চেয়ে অচিন্তনীয় উন্নতি করে চলছো। তবে তোমরা আমার ধম ইসলাম হতে একটি মহৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। তোমরা 'গুড মর্নিং' 'গুড আফটার নুন', 'গুড ইভিনিং' এসব বলে শুভেচ্ছা জানাও। বিষয়টা আমার কাছে খুব এলোমেলো লাগে। সূর্য না দেখে কোনটা বলবো তা স্থির করতে অসুবিধা হয় (সবাই হেসে ওঠলো)। কিন্তু আমাদের সালাম - আস্‌সালামু আলায়কুম (Peace be on you) সকাল বিকাল, আলো আঁধার সব সময়ে একই উচ্চারণ। এতে একই সাথে শুভ কামনা ও শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা হয়। অনেকক্ষণ হাততালি চল্লো। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই তাদের খাতায় কথাটা লিখে দস্তখত দিতে চাইলো। আমি ইংরেজী অক্ষরে বোডে আস্‌সালামু আলায়কুম ও ব্র্যাকেটে ইংরেজীতে অর্থ লিখে দিই ও তাদের খাতায় লিখে নিতে বলি এবং এক কোণায় বসে দস্তখত দিতে থাকি। এ ঘটনার পর সালাম নিয়ে যতই চিন্তা ভাবনা করছি ততই এর তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়েছি।

একটি হাদীসের উল্লেখ দ্বারা আলোচনায় এগোনো যাক। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) জিজ্ঞেস করলো, 'ইসলামের কোন্‌ কাজ সবচে' ভাল ?' তিনি বল্লেন, 'অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া' [সহীহুল বুখারী]।

হাদীসটিতে খেয়ে বাঁচার সাথে সাথে শান্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ শিক্ষা স্থান মালে আবদ্ধ নয়। ভূপৃষ্ঠে মানুষ যতদিন থাকবে যেখানে থাকবে এ শিক্ষার প্রয়োজনও থাকবে।

শুনেছি ইংল্যান্ডে অচেনা লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা (যেমন ট্রেনে) একত্রে বসে থেকেও কথা বলে না। তৃতীয় কোন ব্যক্তি যে উভয়কে চিনে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে না দেয়া পর্যন্ত। ইসলামের 'সালাম' প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বের যে কোন পেশা, ধর্ম ও বর্ণের লোকের সাথে পরিচিতির হেকমত শিখিয়ে দিয়েছে। এর সাথে শান্তির নিবিড় কামনা সংযুক্ত করে ইহাকে অখন্ড মানবতার জন্য কল্যাণের উৎস করে দিয়েছে। শান্তি সবারই কাম্য। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তির জন্যই। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার জাতি সংঘের উদ্যোগে 'বিশ্ব শান্তি দিবস' বেশ শান-শওকতের সাথে সব দেশে পালিত হয়।

সালামের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কুরআন হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো, বাংলা তর্জমা) ঃ

'অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়ারূপ, এইরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুদ্ধির কাজ কর' (আয়াতাংশ ২৪ঃ৬২)।

'এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর সম্ভাষণ জানাইও, অথবা কমপক্ষে উহাই প্রত্যার্পণ করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' (৪ঃ৮৭)।

বড়ই বেদনাদায়ক যে অনেকেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজকাল সালাম দেয় না, তা গ্রহণও করে না। অনেকে 'সালাম' পেয়ে শুধু 'হু' বলে বা মাথা নাড়ায়। আল্লাহ্‌ যে ইহা মোটেও পসন্দ করেন না তা উপরোক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তবে একথাও মানতে হয় যে, মুসলিম জাহানে কোটি কোটি লোক রোজ 'সালাম' বিনিময় করে থাকেন। ভাববার বিষয় তা সত্ত্বেও মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় দেশেই অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অবশ্য অমুসলিম দেশগুলোতেও নানা কারণে অশান্তির ঘাট্‌তি নেই। এমনটি কেন হচ্ছে বিবেকবান লোকদের তা তলিয়ে দেখা দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় শান্তি কামনার সাথে নিষ্ঠার অভাবই মূল কারণ। অন্যদের সম্পর্কে কথা বলার আগে মু'মিনকে আত্ম- জিজ্ঞাসায় রত হতে হবে। তাকে কথা ও আচরণে মিল রাখতে হবে। সালামের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যদি কারো জন্য শান্তি চান তবে তার পক্ষে জ্ঞাতসারে ঐ ব্যক্তির কোন অশান্তির কারণ না হন সে জন্য সজাগ থাকতে হবে। তাকে 'চেনা-অচেনা' সবার শান্তির জন্য সাধ্যমত সক্রিয় থাকতে হবে। এ নীতি দৃঢ় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবলম্বন না করলে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে শান্তির ভিত মজবুত হবে না, নড়বড়েই থেকে যাবে। স্মরণীয় যে, কোন স্বার্থান্ধের দ্বারা কখনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে বিষয়টি সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো যত বড় মহান শিক্ষাই হোক না কেন অন্তসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। হৃদয়ের গভীর পরশ এবং বিরামহীন ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা করতে হয়। বস্তুতঃ এসবের কোনই বিকল্প নেই। এ হলো সর্বকালের সত্য।

৪.৯.১৯৯৯ তারিখের পত্রিকাদিতে দেখা যায় এশীয় পার্লামেন্টারী সম্মেলনে অন্যতম প্রস্তাবে শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তি-বিষয়ক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবী উঠেছে। নিঃসন্দেহে এই সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের যুগে পরিবেশ রক্ষায় মানব কল্যাণের জন্য এ দাবী খুবই গুরুত্ববহ। এতে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বস্তুতঃ কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির 'সিলেবাস' পেশ করেই ক্ষান্ত হয় নি, এর বাস্তবায়নের পথও দেখিয়েছে। তবে এ পথকে শুধু জানলে হবে না, জীবনের সর্বস্তরে ইহাকে কার্যকর রাখতে এবং মু'মিনদেরকে এর প্রধান ধারক ও বাহক হতে হবে। বিশ্ববাসীর দরবারে আরজ রইল আপনারা ইসলামী সালামকে জানুন, বুঝুন ও কাজে লাগান। শান্তিকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত

করা ও বিশ্বায়নের কি মহান প্রয়াস!

খ) যুগ-পরিচিতি

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে বর্তমান যুগ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এ যুগকে নানাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর কতকগুলো খুবই সম্ভাবনাময়। তবে এ সম্ভাবনাসমূহ ভাল বা মন্দ যে কোনটার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ইতোমধ্যে মানুষের নৈতিকতার চূড়ান্ত পতন তথা অবক্ষয়ের দিক থেকেও এ যুগকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করা যায়।

অতি সংক্ষেপে এসবের কিছু বর্ণনা দেয়া যাক। প্রথমে সম্ভাবনাময় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো ঃ ১। ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশনার যুগ, ২। চলনে বলনে দ্রুততার যুগ। এ যেন কুরআনে উল্লেখিত 'কুন ফাইয়াকুনের' ইঙ্গিত দিচ্ছে। ৩। মহাকাশ জয়ের সূচনার যুগ।

৪। 'বিশ্বায়ন' তথা বিশ্ব সংস্থাদি গড়ে তোলার যুগ, ৫। পারমাণবিক যুগ, ৬। বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক 'দিবসাদি' পালনের যুগ ইত্যাদি। এসবের লক্ষ্য হলো 'বিশ্বায়ন' বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বিশ্ব তথা অখন্ড মানবতা বোধকে সক্রিয় করা। অর্থাৎ মিলিত চেষ্টায় বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অচিন্তনীয় অগ্রগতির দরুনই এসব সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের সাথে নিখুঁত আদর্শ ও এর বিধি-বিধানসমূহকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এসব সম্ভাবনা মানবতার জন্য অভিশাপের রূপ নিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই সে চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠছে। সাবধান হওয়ার সময় ও সুযোগ দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন অবক্ষয়ের কিছু মারাত্মক আলামতের কথায় আসা যাক যেমন ঃ ১। নকল ভেজালের যুগ, ২। ঘুষ ও তদবীরের যুগ, ৩। দুর্বৃত্তায়নের যুগ। ইহা ব্যাপকভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। এর মূল নীতি হলো দুর্নীতি অর্থাৎ নিজে যত বেশী খারাপ হওয়া যায় ও সাথীদের যত বেশী খারাপ করা যায় তাতে মত্ত থাকা। নিজের বা দলের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যত বেশী জর্জরিত করা যায়। ৪। ভূয়া, প্রতারণা ও বিশ্বাস হরণের যুগ, ৫। ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের যুগ, ৬। যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপের যুগ, ৭। মদ ও মরণের যুগ, ৮। সন্ত্রাস তথা খুন-খারাবির যুগ, ৯। ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ ও বিস্ফোরণের যুগ ইত্যাদি কুরআনের নানা স্থানে এর নাযেল হওয়ার পরবর্তী যুগের আলামত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এখানে সূরা আত্ তাক্ভীরের ৪-১৩ আয়াতের বাংলা তর্জমা দেয়া হলো ঃ

'এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হইবে, (ডিনামাইট দ্বারা ভাঙ্গা হইবে) যখন পূর্ণ গর্ভ উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে, যখন বন্য জন্তুগুলিকে সমবেত করা হইবে, (যেমন চিড়িয়াখানায়) যখন নদীসমূহকে শুকাইয়া দেওয়া হইবে, যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করা হইবে– কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে ? এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে, এবং যখন আকাশের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইবে, এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে।' এসব আয়াতে এ যামানার অনেক আলামতের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঃ

আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন কিছু বিষয় নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য বিরাজিত অবস্থাকে সঠিকভাবে বুঝা ও মূল্যায়ন এবং এ অবস্থা হতে মুক্তি পথের সন্ধান করা। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দোয়ার আবেদন

আমার বড় ছেলে এডভোকেট মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, হংকং জামাত, সপরিবারে কানাডায় অভিভাসনে রওনা হচ্ছে। তারা যেন নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এবং তার কানাডা অভিবাসন যেন সব দিক থেকে আল্লাহ্তাআলা বরকতময় করেন সেজন্য বিশেষ দোয়ার দরখাস্ত করছি।

আমার দ্বিতীয় ছেলে ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর শুভ বিবাহ কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ নিবাসী এডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুল হক সাহেবের ২য়া কন্যা নুসরত শারমীন শান্তির সাথে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক টাকা হক মোহরানায় সু-সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

২৭/৩/২০০০ সোমবার, বাদ মাগরেব দারুত তবীগ মসজিদে বিবাহ পড়ান সদর মুরব্বী মোহতারম মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

আমার বড় ছেলের বিদেশ চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বিধায় সকল আত্মীয়-স্বজনকে জানানো সম্ভব হয়ে উঠেনি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার ২য় ছেলের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং তারা যেন বংশানুক্রমে জামাতের অধিকতর খেদমত করার সুযোগ লাভ করে সেজন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মেহেরুন্নেছা
প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্, শালগাঁও

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর

রাশিয়ায় ইসলাম ঃ প্রথম যুগ

(৯ম কিস্তি)

রাশিয়ার বিশাল রাষ্ট্রসমূহে মুসলমানদের সংখ্যা চার কোটির অধিক বলা হয়ে থাকে। রুশীয় উজবেকিস্তানের সমরকন্দ, বোখারা ও তাসকন্দের সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর এলাকাসমূহে ইসলাম হিজরী প্রথম শতাব্দীতে পৌঁছে। হিজরী ২২ সালে দ্বিতীয় খলীফার আমলে মুসলমানরা আজারবাইজান পৌঁছে। আর্তিদ ও বাকের বিন আবদুল্লাহ্ এই বিজয়ী জাতির নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার আমলে মুসলমানরা দাঘিস্তান ও তুর্কিস্তান এলাকায় প্রবেশ করে। হিজরী ৪৬ সালে যিয়াদ বিন সুফিয়ান তার বাহাদুর জেনারেল রাবিয়া বিন হারেসকে ইরাক থেকে খোরাসান প্রেরণ করেন। রাবিয়া হরমুজকে পরাজিত করে বল্‌খে তার পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর হিজরী ৫০ সালে মাবিয়া তার পুত্র আবিদ উল্লাহ্‌কে বোখারা জয়ের জন্য প্রেরণ করেন এবং হিজরী ৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রেজা শুক্রবার বোখারা দখল করা হলো (১৯৬৫ সালে ইসলামবাদ থেকে প্রকাশিত আব্‌দুল কুদ্দুস হামসীর ইতিহাস সংকলন)। হিজরী ৫৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার সমরকন্দ দখল করা হলো। এতদসত্ত্বেও ইসলামের প্রকৃত বিজয় কানিবা বিন মোসলেম আল্ বাহালীর কামান দ্বারা হিজরী ৮৬ সালে সূচিত হয় যখন মুসলমান সেনাবাহিনী জেহুন নদী পাড়ি দিয়ে রুশ এলাকায় অগ্রসর হতে থাকলো। এই বিজয় কালে বোখারা, সমরকন্দ, খারজম, ফরগনা ও তাসকন্দ মুসলমানদের পদাবনত হলো। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত গতিতে চললো এবং হিজরী ৯৬ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে সম্পূর্ণ পশ্চিম তুর্কিস্তান (তিয়ানশান পাহাড়ী অঞ্চল ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা) মুসলমানদের দখলে এসে গেল। এই এলাকা জিহুন ও সিনুন নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আরবদের আগমনের পূর্বে এখানকার ভাষা ছিল ফার্সী। পরে আরবী ও ফার্সী ভাষা প্রাধান্য লাভ করলো। আরব ভৌগোলিকগণ মাওয়ারা ওন্নাহার এর স্থানীয় অধিবাসীদের নেক জীবন, সত্যবাদিতা, উদারতা ও অতিথিপরায়ণতায় খুব প্রশংসা করেন।

মাওয়ারাউল নহ্‌র এর এই এলাকাটি ছিল মুসলমান আলেমগণের আশ্রয়স্থল। এই এলাকার হযরত ইমাম বোখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ফারাবী, আল্ বেরুনী, উমর বিন খৈয়াম, আল খারযেমী, ফরগানী, ফেরদৌসী, জামী, বূ আলী সীনা, আবূ লা'সে সমরকন্দী এবং আবূ যায়েদ *আহমদ বিন সোহেল আল্ বলখী ইসলাম ধর্মের* জ্ঞান ভান্ডারে মূল্যবান পুঁজি সংযোজন করেন। সমরকন্দ, মরু, তিরমিযী, বল্‌খা ও কাশগড় ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণের কেন্দ্র ছিল এবং মুসলমানদের মর্যাদার আকাশ ছিল। একজন আরব কবি এর নক্‌শা এভাবে অঙ্কণ করেছেন ঃ

"ইসলামের আলেমগণের ডাক ছিল চতুর্দশী চন্দ্রের আকাশের ন্যায়"।

এই মাওয়ারাউল নহর এলাকার নাম তুর্কিস্তান ছাড়াও খোরাস্তানও ছিল (যা বোখারা ও সমরকন্দে অবস্থিত)। ইহার সম্পর্কে একটি বিখ্যাত আরবী প্রবাদ আছে যে, "জ্ঞান একটি বৃক্ষ, যার শিকর মক্কায়। কিন্তু ইহার ফল খোরাস্তানে পাকে"। যেভাবে ইসলামের প্রথম যুগে এই এলাকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেভাবে ইসলামের দ্বিতীয় জাগরণের যুগে নবীগণের নেতা পাক মোহাম্মদ মোস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই এলাকার লোকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা নির্ধারিত রয়েছে।

হিশাম বিন বসুন মালেকের যুগে গোটা দাঘিস্তান মুসপা হয়ে গিয়েছিল। তুর্কিস্তান ও কাফকাজ বিজয়ের পর ইসলাম মিল ইউরালের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। দোলগার মুসলমান তাতারীদের সাথে সাইবেরিয়ার তাতারদের সম্পর্ক ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতায় সেখানেও ইসলাম দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করে ছিল। ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৭০ খৃষ্টাব্দে) তুর্কিস্তানে আমীর তৈমুর মাথা উঁচু করলেন। উত্তর এশিয়া পদানত করার পর তিনি রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন এবং মস্কো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। তার সেনাবাহিনীতে রুশীয় খৃষ্টানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। চেঙ্গিস খান ও হালাকু খান যেখানে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিল সেখানে তাদের সন্তান ইসলামের মহান সেবা কাজ সম্পাদন করেন, যেখানে আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা (রাঃ) ও ওলীদের পুত্র খালেদ (রাঃ) ইসলামের সেবা করে। সত্য কথা এই যে ঃ

"তাতারীদের অরাজকতার ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিমালয় থেকে উঠে আসে কা'বার রক্ষকগণ"। এখন রুশীয় মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের ও এলাকাসমূহের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

১। উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র

উজবেকিস্তানের পূর্ণ আয়তন ৪,৪৭,৪০০ বর্গ *কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১,৯৯,০৬০০০।* একশতেরও বেশী জাতির মানুষ এখানে বসবাস করে। উজবেক মুসলমানদের অনুপাত শতকরা ৮০ ভাগ। তাসকন্দ ইহার রাজধানী। সমরকন্দ এই প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তর নগরী। বোখারা, ফরগনা, ফিসাদরীয়া এবং সুরখান এই প্রজাতন্ত্রের কতিপয় প্রদেশ।

এই এলাকা বড় বড় খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের জন্ম দিয়েছে, যাদের মধ্যে মোহাদ্দেস, ফেকাশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশারদ অন্তর্ভুক্ত। উজবেকিস্তানে রাশিয়ার শতকরা ৬০ ভাগ কার্পাস উৎপন্ন হয়। বোখারা উঁচু মানের মেট্রেস তৈরীর কেন্দ্র। খিওয়া ভেড়া ও ছাগলের জন্য বিখ্যাত। সেচ ব্যবস্থার দরুন বাগানেরও আধিক্য দেয়া যায়। এর মধ্যে ১২৪০টি বাগানে আপেল এবং ৩০০টি বাগানে আড়ু (আলু বোখারার মত এক প্রকার ফল) চাষ করা হয়। আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক। গ্রীষ্মকাল চলে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এবং শীতকালে তাপমাত্রা শূন্যের নীচেও নেমে পড়ে। এখানে ছোট বড় অগণিত নদী আছে এবং কয়েকটি গ্লেসিয়ারও (হিমপ্রবাহ) আছে। প্রাকৃতিক গ্যাসও উত্তোলন করা হচ্ছে। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪০০তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে ইসলামের কিরণ উমাইয়া যুগে খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের সময় অষ্টম শতাব্দীতে প্রস্ফুটিত হয়। বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি কানিবা বিন মোখলেস বাহালী ৭০৬ খৃষ্টাব্দে ৯ বৎসরের অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এই এলাকাকে উমাইয়া খেলাফতের একটি অংশ বানিয়েছিলেন। এই বিজয়ের পর এখানকার সরকারী ভাষা আরবী ঘোষণা করা হলো। ইহার পর বারশত বৎসর পর্যন্ত এই এলাকা ইসলামী সুলতানাতের অটুট অংশ ছিল। বোখারা, খিওয়াহ্, আওযেক এবং খোকন্দ (কন্দ) প্রদেশ এই এলাকায় কায়েস হলো। সমরকন্দে আলগ বেগের খাদ্য-গুদাম আরাইয়া ফেকাশাস্ত্র, বিবি খানমের জামে মসজিদ, কাশেম বিন আব্বাসের মাজার, রিঘেস্তানের শান জিন্দা (শাহ্ জান্দা) মাদ্রাসা- এ সকল দর্শনীয় স্থান আজও দেখা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার জাররা এই সকল এলাকা দখল করে নিল এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন জারের শাসনের সমাপ্তি হলো তখন মুসলমানেরা সমরকন্দ, খোকন্দ এবং বোখারার স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। তারা কমিউনিষ্টদের সাথে পরবর্তী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সংগ্রামরত ছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দে একটি নিখিল তুর্কিস্তান ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বসম্মতিক্রমে তুর্কিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সোসালিষ্ট ইহা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল। কমিউনিষ্টদের লাল ফৌজ এম ফিরোজের নেতৃত্বে মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলার সূচনা করে দিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা ও আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল। সর্ব প্রথমে আলেমগণকে লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হলো। যারা আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় নকশবন্দীয়া এর অনুসারী ছিল তারা সাম্যবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় বড় কঠোরভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু এই ধরনের আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়কে বল প্রয়োগ ও নির্যাতনের দ্বারা দাবানো যায় না। কোন না কোনভাবে ও কোন না কোন আকারে তারা বিদ্যমান থাকে। মসজিদে তালা লাগিয়ে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা বৃদ্ধি করে যদি সাম্যবাদীরা এ কথা বুঝে থাকে যে, তারা তাদের আত্মা ও অন্তর থেকে তাদের বিশ্বাসের প্রতি ভালবাসা মিটিয়ে দিয়েছে, তবে এটা ছিল তাদের খুব বড় রকমের খাম খেয়ালী। ইসলামী বিশ্বাস মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, জীবন-ধারা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-সাদী, ও সংস্কৃতির আকারে অবশ্য বিদ্যমান রয়েছে। মধ্য এশিয়া থেকে প্রাপ্ত তরতাজা সংবাদ অনুযায়ী লোকেরা ভাঙ্গা মসজিদ মেরামত ও নূতন মসজিদ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। অন্য কথায় ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য কর্মকান্ড পূর্ণ আবেগ ও জোশের সাথে শুরু হয়ে গেছে।

(মধ্য এশিয়ার নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, কেরামত আলী খান কর্তৃক প্রণীত, পৃষ্ঠা ১৪)

জাতি সংঘের প্রেসিডেন্ট স্যার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান

জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট স্যার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান ১৯৬৩ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়গ্রাহী অভিজ্ঞতার কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন ঃ

সমরকন্দ

"১৯৬৩ সালে আমি ইহার ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধসমূহ দেখার জন্য গিয়েছিলাম। আমি স্বর্ণালী সমরকন্দকে তদ্রূপই দেখেছি বরং এর চেয়েও অধিক সুন্দর দেখেছি যেরূপে এর খ্যাতি ছিল। এ সকল স্মৃতিসৌধ দেখার বাসনাই আমাকে উজবেকিস্তান টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি কারণে আমীর তৈমুরের মাজারে তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার আকাংখা ছিল এবং তা আল্লাহ্র ফযলে পূর্ণ হলো। শুনেছিলাম এবং চোখেও দেখলাম যে, তার কবর তার নির্দেশ অনুযায়ী তার গুরুত্ব মোরশেদ এর পায়ের দিকে। 'এইতো মুসলমান যারা শাসন করেছে এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কও রেখেছে' – কথাটা সত্যায়িত হয়েছিল তার জীবনে। সমরকন্দ ও সমরকন্দের আশে পাশে অন্যান্য স্মৃতিসৌধ, মাদ্রাসা, খানকা, ও খাদ্য-গুদামসমূহ শিক্ষাগ্রহণের চোখ নিয়ে অশ্রুভরা নয়নে দেখেছি এবং প্রত্যেক স্থানে হৃদয়ের আক্ষেপ নিয়ে রব্বুল আলামীনের দরগাহে নিবেদন করতে থাকি যে, "হে সর্বশক্তিমান খোদা! এখন তুমি তোমার পরিপূর্ণ ফযল দ্বারা আমাদের অন্ধকার রজনীকে দিবালোকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইসলামের সূর্যকে দ্বিপ্রহরে পৌছে দাও (আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন) (আল্ হামদুলিল্লাহ্ চৌধুরী সাহেবের এই দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় এখন এসে গেছে এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রসমূহেও ইসলামের দ্বিতীয় জাগরণের যুগের সূচনা হয়ে গেছে- মুনীর)

সম্পদশালী উপত্যকার শহর সমরকন্দে (যার ২৫০০ বার্ষিকী ১৯৭০ সালে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল - লেখক) আমাদের অতিথিসেবক ছিলেন সেখানকার মেয়র। দুপুরের খাবার আমরা তার গৃহে খেলাম। পোলাও, কোরমা, নান, কাবাব, হালুয়া, ফল ও পানীয় এখানেও পরিবেশন করা হয়েছিল। খাওয়ার পর মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, এখন প্রোগ্রাম কি ও ভাল হতো যদি একটু বিশ্রাম নিতেন। আমি বললাম, এখন নামাযের সময় হয়ে গেছে। এতে অতিথিসেবক ওযূর জন্য আমাকে গোসলখানার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন.এবং যখন আমি ওযূ করে নামাযের জন্য তৈরী হলাম তার পূর্বেই কাবার দিকে মুখ করে নামাযের মসলা বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। সমরকন্দ বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার দিক থেকেও একটি জমজমাট শহর। বাজারে আমরা অনেক কিছু দেখলাম। তদুপরি আরো দেখলাম চামড়ার টুপীর দোকান। সমরকন্দ চামড়ার টুপীর ব্যবসার বড় কেন্দ্র।

সমরকন্দ কর্পোরেশন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন-সমূহের দেখাশুনা, মেরামত ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। এর অন্যতম কারণ ইহাও যে, নিদর্শনসমূহ পর্যটকদের নিকট দারুণ আগ্রহের বস্তু এবং এগুলো দেখার জন্য বিপুল সংখ্যক পর্যটক সরকন্দ আসেন।

তাশকন্দ

মস্কো থেকে আমরা গেলাম তাশকন্দে। ইহা উজবেকিস্তানের রাজধানী। আমাদের ভ্রমণ ছিল এরোফ্লটের বিমানে। অভ্যন্তরীণ সফরের জন্য উড়োজাহাজের ভাড়া আন্তর্জাতিক ভাড়ার তুলনায় অনেক সস্তা। রুশীয় উড়োজাহাজের গতিতো খুব দ্রুত। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা এই পর্যায়ের নয় বা নন কমিউনিষ্ট কোম্পানীগুলোর মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এর তুলনায় ভাড়া এত সস্তা যে, দেশীয় ভ্রমণকারী মুসাফের স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে এই সামান্য পার্থক্য সম্ভবতঃ অনুভব করে না। তাশকন্দ ও সমরকন্দের দালান-কোঠা ও জনবসতি ঐ দৃশ্যই তুলে ধরে, যা মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ শহরে দেখা যায়। মসজিদ ও মাযারের নির্মাণ শৈলীও একই ধরনের। রাস্তাঘাট ও বাজারও তদ্রূপই ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণতঃ ইউরেশিয়ান ধরনের। সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় আস্‌সালামু আলায়কুম ও ওয়া আলায়কুম সালাম বলার রীতি সাধারণ ছিল।

রুশ সরকারের আকৃতি বাহ্যতঃ ফেডারেল। দেশটির বর্তমান সরকারী নাম ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক (ইউ এস এস আর), অর্থাৎ সংঘবদ্ধ সাম্যবাদী সরকার। এই সকল প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা ষোলটি। প্রজাতন্ত্রগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাধীন বিবেচনা করা হয়। এদের মধ্যে দু'টো অর্থাৎ ইউক্রেন ও বিলারুশ জাতি সংঘের সদস্যও। উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের আয়তন অনেক বিস্তৃত। পূর্বে ফরগনা, মধ্যে তাসকন্দ, পশ্চিমে সমরকন্দ ও বোখারা অঞ্চল- এ সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এই ছয়টি মুসলমান প্রজাতন্ত্রের ভাষায় অনেকাংশে অভিন্নতা রয়েছে। ইহার বুনিয়াদ হলো তুর্কী। এই সকল ভাষার মধ্যে আরবী, ফার্সী ও তুর্কীর অনেক শব্দ আছে। তাজিকী ভাষা সম্পর্কে বলা হয় যে, ১৯২৫ সাল পর্যন্ত একজন উর্দূ জানা লোকের জন্য তাজিকী, উজবেকী ভাষা শিখা নেহায়েত সহজ ছিল। কেননা, ঐ সময় পর্যন্ত এই সকল ভাষার অক্ষর ছিল ফার্সী। ১৯২৫ সালে ফার্সীর স্থলে ল্যাটিনী অক্ষরের প্রচলন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এই ল্যাটিনী অক্ষর রহিত করে রুশীয় অক্ষরর প্রচলন করা হয়। এর ফলে এ সকল প্রজাতন্ত্রের ভাষাসমূহ ও ফার্সী উর্দূর মধ্যে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গেল, যদিও আমার তাশকন্দ ও সমরকন্দ সকলের সময়ও অধিকাংশ শিক্ষিত উজবেকীর মধ্যে ফার্সী ভাষায় কিছুটা দক্ষতা নিশ্চয় দেখেছি। এই সকল প্রজাতন্ত্রের আসল জনবসতি মুসলমান। তাদের নামও মুসলমান, যদিও নামের শেষাংশে রুশীয় শব্দ জুড়ে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাশকন্দের মুফতী আযমের নাম জিয়াউদ্দিন বাবা খানুফ। এই নামেই তাঁকে ডাকা হয় এবং এ নামই তাঁর লেখা হয়। তিনি তাশকন্দের মুফতী আযম এবং সাংস্কৃতিক বোর্ডের সভাপতিও। তাঁর পূর্বে তাঁর মরহুম পিতা তাশকন্দের মুফতী ছিলেন এবং আশা করা হয় যে, তাঁর পরে তাঁর পুত্র আকবর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। (চলবে)

অনুবাদ - নাজির আহমদ ভুঁইয়া

এম. টি.এ. ডাইজেস্ট

(ডিসেম্বর ১৬, ১৯৯৯ – জানুয়ারী ৩১, ২০০০)

বায়তুদ্দোয়াতে দোয়ার কবুলিয়ত

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সম্প্রচারিত (৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ ধারণকৃত) নবীন লাজনা (Young Lazna)-র সাথে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে- (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর সভায় একজন প্রশ্ন করেন, বায়তুদ্দোয়াতে (কাদিয়ানের সেই ছোট্ট ঘর যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রায়ই নিভৃতে দোয়া করতেন) সকল দোয়াই কবুল হয় কিনা। হুযূর (আইঃ) উত্তরে বলেন, না হয় না।

দুরারোগ্য রোগীর আরোগ্যের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন

একই অনুষ্ঠানে হুযূর আকদস (আইঃ)-কে একজন প্রশ্ন করেন যে, কোন কোন Specialist healer (এমন ডাক্তার যারা অগতানুগতিক পদ্ধতিতে বিশেষ কোন কোন রোগের চিকিৎসা করেন) এমন আছেন যারা দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করতে পারেন বলে দাবী করেন। কারো অসুখের যদি গতানুগতিক চিকিৎসায় আরোগ্য না হয় তবে কি এরূপ চিকিৎসা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে ? হুযূর (আইঃ) বলেন, হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি বা অন্য কোন প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতিকেই অবহেলা করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে, সব রোগেরই চিকিৎসা আছে; কেউ তা জানে, কেউ তা জানে না। তাই প্রয়োজনে অন্যান্য পদ্ধতিও বিবেচনা করা উচিত।

খলীফা হওয়া সম্পর্কে পিতা-মাতার জ্ঞান

এ অনুষ্ঠানেই আরেকজন জানতে চান, হুযূর (আইঃ) যে একদিন খলীফা হবেন-এ সম্পর্কে তাঁর পিতা-মাতা জানতেন কিনা। হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদিন তাঁর মা হযরত উম্মে তাহের (রাঃ) কাঁদছিলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল কেন কাঁদছেন, তিনি বললেন, তিনি খুশিতে কাঁদছেন। কেননা (খুব সম্ভবতঃ-সংকলক) হুযূর, অর্থাৎ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁকে বলেছেন যে, তাহের খলীফা হবে। এ ঘটনাটি হুযূর (আইঃ) খেলাফতে আসীন হওয়ার পরে তাঁকে জানানো হয়।

আরবী সকল ভাষার জননী

আরেকটি প্রশ্ন ছিল কুরআনে আল্লাহ্তাআলা ভাষা শিখিয়েছেন বলে যে কথাটি রয়েছে, সেই ভাষা কি আরবী ছিল ? হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, মসীহ মাওউদ (আঃ) 'মিনানুর রহমান' গ্রন্থে ১২টি নীতি বর্ণনা করেছেন এবং এর সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সকল ভাষা আরবী হতে উদ্ভূত, অর্থাৎ আরবী 'উম্মুল আল্ সিনা' বা ভাষাসমূহের জননী। এ ১২টি নীতি ব্যবহার করে মৌলানা শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব ৪৫টি ভাষার শব্দাবলী আরবী থেকে উদ্ভূত বলে প্রমাণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর Traced to Arabic সিরিজের সিরিজে বইগুলো যেমন English Traced to Arabic, Sanskrit traced to Arabic ইত্যাদি অসাধারণ গবেষণা কর্মের ফল।

ওকালতিতে অনুসরণীয় নীতি

ওকালতিতে কখনো কখনো অপরাধীর পক্ষ নিয়েও যে কাজ করতে হয় এ সম্পর্কে ঐ অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, কোন মক্কেল তাঁর গোপন বিষয়াবলী উকিলের সামনে উন্মোচন করে। তাতে যদি বুঝা যায় যে, সেই মক্কেল প্রকৃত অপরাধী তবে তার পক্ষে ওকালতি করা উচিত নয়। আবার তার গোপন তথ্যগুলো প্রকাশও করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে আমাদের জামাতের বিশিষ্ট বুযর্গ মৌলানা শেখ মুহম্মদ আহমদ মাযহার সাহেবের নীতিটিই আদর্শ নীতি। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। খুব নরমভাবে বিনয়ের সাথে মক্কেলকে বলতেন, বলতো ভাই আসল বিষয়টা কী ? যদি মক্কেল প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকেন, তবে তিনি কেস নিতেন না। অপরপক্ষে, মক্কেল সত্য হলে জবরদস্ত সাহায্য করতেন। বিচারকরাও জানতেন যে, প্রকৃত অপরাধীর পক্ষে তিনি ওকালতি করেন না। তাই তিনি কোন কেস নিলে কদাচিৎই পরাজিত হতেন।

পর্দার বয়স

এ অনুষ্ঠানে পর্দার বয়স কখন হয়, এ প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন, যে বয়সে কোন মেয়ে অপরকে আকর্ষণ করতে শুরু করে সেটাই পর্দার বয়স।

অমুসলিমের জান্নাত

অমুসলমানেরা কি জান্নাতে যেতে পারে- প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এটি আল্লাহ্র ইচ্ছা।

নযর লাগা বলে কিছু আছে কি ?

নযর লাগা বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, একটি বিষয় যা আছে তা হ'ল সম্মোহন (Mesmerism)। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন, তাঁর কোন এক চাচাতো বা এরূপ এক বোন (Cousin) যখন তাঁর দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশের সাথে তাকাতেন তখন তাঁর হাতে পানি থাকলে তা পড়ে যেতো। কিন্তু, অনেক সময় কারো সন্তান না হলে বা কোন দুর্ভাগ্যের শিকার হলে বলা হয় যে, অমুকের নযর লেগেছে। এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা।

হুযূর (আইঃ)-কে এ অনুষ্ঠানেই এবছর আন্তর্জাতিক শূরায় বিশ্বের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ মানুষের কাছে আমাদের সাহিত্য পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন, যেভাবে বই-পত্র প্রকাশ ও বিতরণ চলছে তাতে আশা করা যায় যে, এটি সফল হবে।

হুযূর (আইঃ)-এর মায়ের প্রিয় স্মৃতি

আরেকজন জানতে চান, হুযূর (আইঃ)-এর কাছে তাঁর মায়ের কোন্ অভ্যাসগুলো বড় প্রিয়। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, তাঁর মায়ের রসূল (সঃ)-এর প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল। "বালাগাল উলা বে কামালেহী ....." নাতটি তিনি বড় প্রিয় সুরে গাইতেন। আর তাঁর নামাযের বড় শখ ছিল। তখন যিনি আমাদের মুয়ায্যিন ছিলেন, এখনো বেঁচে আছেন এবং বর্তমানে জার্মানীতে আছেন তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল আমাকে ফজরে জাগানোর। ছোটবেলায় আমি উঠতে চাইতাম না। তিনি এসে হাত ঝাঁকাতেন। আমি বলতাম, "হাত ঝাঁকাচ্ছেন কেন।" বলতেন, "ঘুম থেকে জাগানোর জন্য।" আমি হাত নেড়ে বলতাম, "হাত জেগে গেছে"। কিন্তু উঠতাম না। এরপর তিনি পা ঝাঁকাতেন। আমি বলতাম যে, পা উঠে গেছে। এভাবে না জাগলে তাঁর উপর আমার মায়ের নির্দেশ ছিল আমাকে কোলে করে নিয়ে পানির কলের নিচে ধরার জন্য। এভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি আমাকে নামাযে পাবন্দ করেছেন।

গল্পের বই পড়া

একই অধিবেশনে Fiction (এমন সাহিত্য যেখানে কোন কল্পিত বিষয় বর্ণিত হয় যেমন- গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি) পড়া সম্পর্কে অভিমত চাওয়া হলে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, তিনি Fiction এবং Non-Fiction (বাস্তব বিষয়ের উপর রচিত সাহিত্য, যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ভূগোল ইত্যাদি) উভয় ধরনের সাহিত্যই পড়ে থাকেন, অবশ্য Non-Fiction-ই বেশী পড়েন। এ প্রসঙ্গে বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কাদিয়ানে যে লাইব্রেরী ছিল তা দৈনিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও যেন তিনি ঢুকতে পারেন এজন্য কোন একটি দরজা আলগা করে রাখতেন। এরপর তিনি ঢুকে নির্বিঘ্নে একের পর এক বই পড়তেন। এভাবে সেই লাইব্রেরীর সব বই তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেও দেশী ও বিদেশী প্রখ্যাত গল্প-উপন্যাসও ছিল। হুযূর (আইঃ) ঐ সময়ে (অর্থাৎ নভেম্বর,

১৯৯৯) যে গল্প পড়ছিলেন তার ঘটনাও অনুষ্ঠানে তিনি বর্ণনা করেন।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পুনঃ প্রচারিত (১৬ই নভেম্বর ১৯৯৯ ধারণকৃত) বাংলা 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে ইসলামে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, সকল ক্ষেত্রেই মহিলাগণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে মহিলাগণ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধে (খুব সম্ভবতঃ) নেতৃত্বও দিয়েছেন। কিন্তু, মূল বিষয় যেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তা হ'ল নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করা। আর এটি নিজ আচরণে প্রকাশিত হয়। কতক মহিলা এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ করে থাকেন যে, পর্দার সাথে বড় বড় মহলে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এক আহমদী ছাত্রী কিছুদিন পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। পুরস্কার দিতে বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা রাজ পরিবারের কোন সদস্য এসেছিলেন। সেই ছাত্রী পূর্বেই বলে রেখেছিলেন যে, Handshake (হাত মিলানো) তিনি করবেন না। এসব বিষয়ে ইংরেজরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর হলেও তার ব্যক্তিত্বের কারণে তারা এটা মেনে নিয়েছিলেন। তার কোন অসুবিধাই হয় নি।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আলোকপাত

একই অনুষ্ঠানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দলে দলে আহমদীয়ত গ্রহণ করছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বর্তমানের প্রথম বিশ্ব অর্থাৎ উন্নত দেশ তথা পরাশক্তিগুলোর মানুষ সেভাবে সত্যকে গ্রহণ করবে। তাদের দর্প চূর্ণ হওয়ার জন্য এ যুদ্ধ আবশ্যক।

সংকলন ঃ **আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক**

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার

আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি = (হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু)।

লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা = তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

খালক্‌তানী ওয়া আনা আবদুকা = তুমি আমার সৃষ্টি-কর্তা এবং আমি তোমার বান্দা।

ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা = এবং আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর এবং প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম আছি।

মাস্‌তাতা তু = যতদূর আমার দ্বারা সম্ভব হয়।

আউযুবিকা মিন শারমীন মা সানা'তু = আমি যে সব মন্দ কাজ করেছি আর মন্দ ফলাফল থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয় চাই।

আবুও লাকা বিনি' মাতিকা আলাইয়া = আমি স্বীকার করছি যে সকল নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়েছ।

ওয়া আবুও বেযাম্‌বি ফাগ্‌ফিরলি = এবং আমি আমার গুনাহ্‌সমূহ স্বীকার করছি, অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্‌তা = কেননা, তুমি ব্যতীত কেউ ক্ষমাকারী নেই। (বুখারী)।

একটি গুরুত্বপুর্ণ দোয়া

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) অনেক বেশী দোয়া করতেন। আমরা একবার হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুযূর (সঃ) যত দোয়া করেন আমরা ততটা পারি না। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন দোয়া বলব না, যে দোয়া সকল দোয়ার কাজ করবে ? হুযূর (সঃ) বললেন, তোমরা বল,

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌য়ালুকা মিন খায়রিন মা সায়ালাকা মিনহু নাবীয়ুকা মুহাম্মদ (সঃ) ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিন মাস্‌তা'যা মিনহু নাবীয়ুকা মুহাম্মদ (সঃ) ওয়া আন্‌তাল মুসতায়ানো ওয়া আলায়কাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ীল আযীম"।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট থেকে ঐ সকল কল্যাণ কামনা করছি যা তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) তোমার থেকে কামনা করেছেন। আমি তোমার নিকট ঐ সকল অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা ও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে প্রিয় নবী (সঃ) তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। একমাত্র তুমিই এমন এক সত্তা যাঁর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় এবং পৌঁছে দেওয়া একমাত্র তোমারই কাজ। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন ক্ষমতা ও প্রাধান্য নেই।

সংগ্রহ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী

মোয়াল্লেম নিয়োগ

আহমদীয়া মুসলিম, বাংলাদেশের অধীনে অনতিবিলম্বে কিছু সংখ্যক মোয়াল্লেম আবশ্যক। আহমদীয়া ভ্রাতাদের নিকট হইতে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাদা কাগজে স্বহস্তে লেখা দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে।

দরখাস্ত স্পষ্টাক্ষরে প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, বয়াতের তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখ সহ আগামী ৩০-০৪-২০০০ইং তারিখের মধ্যে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ঃ

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এস, এস, সি / ফাযিল পাশ হইতে হইবে।

২। বয়স- অনধিক ২৫ (পঁচিশ) বৎসর।

৩। অবিবাহিত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৪। প্রত্যেক প্রার্থীকে ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রার্থীকে ১ (এক) বৎসরের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইবে।

৫। পূর্ণ ১ (এক) বৎসর প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। প্রশিক্ষণরত অবস্থায় পকেট খরচ বাবদ টাকা ৳ ৩০০/= (তিনশত) টাকা ভাতা প্রদান করা হইবে। থাকা-খাওয়ার খরচ কেন্দ্রীয় জামাত বহন করিবে।

৬। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। জামাতের নিয়ম-কানুন মোতাবেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হইবে।

৭। দরখাস্তের সাথে স্থানীয় জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক বর্তমান তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং চারিত্রিক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৮। স্বেচ্ছায় যাহারা জামাতের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন বা জামাত কর্তৃক চাকুরীচ্যুত হইয়াছেন তাহাদের দরখাস্ত করার প্রয়োজন নাই।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান
মোয়াল্লেম নিয়োগ-কমিটি / ২০০০ইং

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(৭ম কিস্তি)

আমার দৃষ্টিতে চরিত্রের ভিত্তিকে মুসলমানগণ কুরআন করীমের আলোকেও ভালভাবে বুঝে নি। আমি কুরআন করীমের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফলে ইহা বুঝেছি যে, চরিত্রের ভিত্তি অনেক গভীরে এবং অনেক দূরে চলে যায়। যদি মানুষের মধ্যে কেবল কর্মসমূহ পাওয়া যায় যেগুলোকে চরিত্র বলা হয় তাহলে প্রথম দল যে পরিচিতি দান করেছে তা সঠিক বলে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ ধরনের কর্ম নির্বাক বস্তুসমূহের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, তারা বলে বুদ্ধি, কাম-শক্তি ও ক্রোধ মিলিত হয়ে চরিত্র সৃষ্টি হয়, আর ভালবাসাও একটি গুণ যা জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তারা বলে, বুদ্ধি এবং কাম-শক্তি বা ক্রোধ মিলিত হয়ে সর্বপ্রকার চরিত্র সৃষ্টি হয় কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বুদ্ধি নেই। এতদ্সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভালবাসা রূপ গুণ যা চরিত্রের মধ্যে গণ্য, তা পাওয়া যায়। এজন্যে জানা গেল যে, বুদ্ধি কাম-শক্তি ও ক্রোধ চরিত্রের ভিত্তি নয়। নচেৎ জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কোন গুণ পাওয়া যেত না।

আমি এই বিষয়ের ওপরে চিন্তা করেছি এবং খোদাতাআলার ফযলে আমার কাছে এমন নতুন বিষয় উদঘাটিত হয়েছে যে, ইহা চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের মূল কতিপয় শক্তিতে নিহিত যা কেবল মানুষের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় না বরং জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও পাওয়া যায়। আর কেবল জড় পদার্থের মধ্যেই পাওয়া যায় না বরং অণু পরমাণুর মধ্যেও পাওয়া যায় যদ্বারা জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখে নাও, মানবের পরে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও মানবের সদৃশ কাজ-কর্ম পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে ক্রোধ আছে। জন্তু-জানোয়ারও রাগান্বিত হয়। মানুষ ভালবাসে। জন্তু-জানোয়ারও আদর করে। এখন আমি এথেকে আরও নিম্নস্তরের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি অর্থাৎ গাছ-পালার দৃষ্টান্ত নিচ্ছি। উহাদের মধ্যেও আমরা এমন কার্য-কলাপ দেখে থাকি যা কিনা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই পার্থক্য দেখা যায় গাছ-পালার মধ্যে। এ কার্য-কলাপ খুবই নগণ্য মানের পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ যেভাবে মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তেমনিভাবে গাছ-পালার মধ্যেও রয়েছে। আজকাল নতুন গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রায় সব গাছ-পালার মধ্যে নর-নারী আছে (যদিও কুরআন করীমে এ বিষয় আগেই বর্ণনা করা হয়েছে)। আর যখন নর-নারী মিলিত হয় তখন ফল ধরে। খেজুরের ব্যাপারে একথা হাজার হাজার বছর আগে ইহা জানা ছিলো। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, গাছ-পালার মধ্যে সঙ্গম-প্রথা মজুদ আছে। আবার তাদের মধ্যে ক্রোধের অস্তিত্ব। সম্বন্ধেও জানা যায়। ডাঃ বোস (স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু-অনুবাদক) যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ইহা প্রমাণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে লজ্জাবতী গাছকে দেখো। আঙ্গুলের স্পর্শের সাথে সাথে পাতাগুলো মুদে যায়। যদি ইহার ফলে হাত লাগানো যায় তাহলে নিজের অভ্যন্তরস্থ বীজ বাইরে নিক্ষেপ করতঃ উহা মুদে যায়। আমেরিকায় একটি গাছ আছে যদি রক্ত-মাংসের শরীর সম্বলিত কোন কিছু উহার নিকটে যায় তাহলে উল্লসিত হয়ে উহা ছড়িয়ে যায়। আবার যদি ঐ জিনিষ উহার গায়ে লেগে যায় তাহলে উহা মুদে যায় এবং উহার রক্ত পান করে উহাকে নিক্ষেপ করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গাছ-পালার মধ্যেও এ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়।

এখন আমরা আরও নিম্ন স্তরের জিনিষের দিকে তাকাচ্ছি এবং জড় পদার্থকে নিচ্ছি। বলা হয় যে, মানুষের মধ্যে ভালবাসা একটি বড়-উচ্চ গুণ; কিন্তু ভালবাসা কী জিনিষ ? ভালবাসা বলতে নিজের দিকে আকৃষ্ট করাকে বুঝায়। তাহলে পরে চুম্বক লোহাকে কি নিজের দিকে আকর্ষণ করে না এর মধ্যেও এই আবেগ রয়েছে কিন্তু খুবই সাদা-সিদা আবেগ। এর তুলনায় বিদ্যুতের একই রকম শক্তি যদি দু'টি বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া যায় তাহলে ঐ উভয় বস্তুই একে অপরকে বিকর্ষণ করবে। যেন একে অপরকে ঘৃণা করছে। অতএব ইহা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ভালবাসা ও আকর্ষণ এবং ঘৃণা ক্রোধের উপকরণ জড় পদার্থের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

আবার আমি বলেছি যে, এসব শক্তি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুর মধ্যেও মজুদ রয়েছে। যদি এদের মধ্যে এসব শক্তি না থাকতো তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিই হতে পারতো না। যদি অণুগুলো একে অপরকে আপ্সে আকর্ষণের মাধ্যমে একত্রিত না হতো তাহলে কোন বস্তুর পৃথিবীতে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে যেতো। ইহা আকর্ষণ করার শক্তি বৈ কিছু নয়। ইহা অণুগুলোকে আপ্সে সংবদ্ধ করে রাখছে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, চরিত্রের মূল খুব গভীরে অবস্থিত। যদিও ইহা ঠিক যে, যতই আমরা নিম্ন শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে পরে আমরা কতক চরিত্রের সন্ধান পাই আর কতকের সন্ধান পাইও না। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, সব স্থানে মূলের অবস্থিতি মজুদ আছে।

এ বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত করে দেবার পরে যে, যেসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ ঘটে উহা অণু-পরমাণুর বিশ্বেও পরিদৃষ্ট হয়। এখন আমি চারিত্রিক মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি। মনে রাখা উচিত যে, মৌলিক পদার্থের প্রাথমিক অবস্থার ওপরে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেভাবে মৌলিক পদার্থের ছ'টি দিক (Dimension) রয়েছে অর্থাৎ ওপরে-নীচে, ডানে-বামে ও সম্মুখে-পশ্চাতে। এভাবে ছয়টি অভ্যন্তরীণ দিকও রয়েছে এবং ওগুলো নিজের তুলনার দিক থেকে এভাবে জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে যেভাবে বাহ্যিক দিকগুলো জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করছে। অর্থাৎ যেভাবে বাহ্যিক দিক থেকে একের তুলনায় অন্য দিক থেকে যেমন, ডান হয়ে থাকলে অন্যের তুলনায় বাম। এক তুলনায় সম্মুখ হয়ে থাকে এবং অন্য তুলনায় পিছন। এক তুলনায় উপর হয়ে থাকে তো অন্য তুলনায় নীচ হয়ে থাকে। এমনিভাবে অভ্যন্তরীণ দিকও তুলনামূলকভাবে ছ' ছ' প্রকার হয়ে থাকে যেমন, নর-নারী সম্বন্ধীয়। অন্যের ওপরে স্বীয় প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং অন্যের কাছ থেকে প্রভাব গ্রহণকারী। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, সেই বস্তুর ওপরে কোন প্রভাব পড়তে পারে না, যা কিনা প্রভাব গ্রহণ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আটা নরম হয়ে থাকে এর মধ্যে মুষ্ঠি ঢুকে যায় কিন্তু টেবিলে ঢুকতে পারে না। কেননা, ইহা উহার প্রভাব গ্রহণ

করে না। এথেকে জানা গেলো, তখনই কোন কাজ হতে পারে যখন এক দিকে কাজ করার সামর্থ্য ও অন্য দিকে প্রভাব গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকে। প্রত্যেক অণু যার অস্তিত্ব জানা গেছে এর মধ্যে আকর্ষণ করার ও আকর্ষিত হওয়ার শক্তি আছে।

প্রথমত ঃ অভ্যন্তরীণ দিকগুলোর আকর্ষণ করার শক্তি আছে আর উহার সাথে ঝুঁকার শক্তি থাকলে প্রয়োজনীয় জিনিষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। উহা আকর্ষণ করতে থাকবে বা অন্যদিকে ঝুঁকে যেতে থাকবে। এভাবে **দ্বিতীয় দিক** হলো বিকর্ষণ করা এবং উহার সাথে অন্য শক্তি হলো এড়িয়ে চলা। **তৃতীয় বৈশিষ্ট্য** হলো প্রতিটি অণুর বিলীন হওয়া। প্রত্যেক বস্তু যা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে অন্য জিনিষকে বিলীন করে দেয়। যেমন, আমি আমার হাত এখান থেকে উঠিয়ে ওখানে রাখলে পরে প্রথমে হাত রাখা যে আকৃতি ধারণ করেছিলো উহা বিলীন করে অন্য রকম করা হয়েছে। এমনিভাবে অণুগুলো যখন প্রভাব গ্রহণ করে নতুন আকৃতি ধারণ করে তখন প্রথম অবস্থার ওপরে লয়ের অবস্থা আরোপিত হয়ে থাকে। উহার মধ্যে লয়-প্রাপ্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য নিহিত অর্থাৎ প্রতিটি অণুর মধ্যে যেখানে অন্যকে বিনাশ করার যোগ্যতা আছে সেখানে স্বয়ং উহার মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতাও আছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়ীত্ব। কোন বস্তু পতিত হওয়ার পূর্বে দেওয়াল থাকলে উহা ঠেকনার কাজ করবে। ইহা স্থায়ী থাকার শক্তি। এর মধ্যে নিহিত বৈশিষ্ট্য হলো বাকা বা স্থায়ীত্ব অর্থাৎ স্থায়ী থাকার যোগ্যতা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো বিকাশ লাভ অর্থাৎ কতক বস্তু সম্মুখে নিয়ে আসা, প্রকাশ করা। প্রত্যেকটি অণু অন্যটিকে সামনে এগিয়ে দেয়। উহাকে স্থূল ও প্রকাশমান করে দেয়। উহার মধ্যে বিকশিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রতিটি অণুর মধ্যে বিকশিত হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো গুপ্ত হওয়া অর্থাৎ কোন বস্তুকে বিলুপ্ত করে দেয়া। যেমন আমার হাতের পিছনে যদি কোন বস্তু থাকে তখন ইহা উহাকে লুকিয়ে ফেলবে। এর মধ্যে গুপ্ত হওয়া বা লুকানোর শক্তি নিহিত আছে। অর্থাৎ নিজ সত্তাকে গুপ্ত করে দেয়া বা অন্যের ছায়ায় অবস্থান নেয়া।

এই সব শক্তি যা জড় পদার্থের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অংশের মধ্যে পাওয়া যায় তা আখলাক ও চরিত্রের ভিত্তি। সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তি এগুলোর ওপরে। আর ইহাই উন্নতি করতে করতে মানুষের মধ্যে এক বিস্ময়কর আকৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকে। জড় পদার্থ যতটুকু মিশ্রিত হতে থাকে অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো মিশে যেতে থাকে। উহার কর্মসমূহে আধিক্য ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়ে যেতে থাকে। জড় পদার্থ যতটা উন্নতি করে থাকে এসব বৈশিষ্ট্যাবলী উন্নত রীতিতে ও বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং যতই নগণ্য হয়ে যেতে থাকে ঐসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশ নগণ্য ও সীমাবদ্ধ হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অকৃত্রিম জড় পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এসবের প্রকাশকে ভাল ও মন্দ তো বলতে পারি কিন্তু উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা খারাপ বলতে পারি না। যেভাবে আমরা প্রত্যেক বস্তু যা কাজ দেয় না আমরা উহাকে খারাপ এবং যা কাজ দেয় উহাকে ভাল বলতে আরম্ভ করি। আর উহার অর্থ এই হয়ে থাকে যে, এই দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এদের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বা হচ্ছে না। দেখো এই যে লাঠি যদি ইহা কারও গায়ে গিয়ে পড়ে তাহলে ইহা তার নিকট খারাপ বলে মনে হবে কিন্তু ইহা বলবে না যে, ইহা এই লাঠির অপকর্ম। এভাবে যদি কেউ কোথাও একটি পরিত্যক্ত পয়সা পায় তাহলে সে বলবে ভালই হলো। কিন্তু ইহা বলবে না যে, ইহা পয়সার অনুকম্পা। সুতরাং কর্ম যখন জড় পদার্থের বিকাশ হিসেবে সংঘটিত হয় তখন আমরা ভাল কিম্বা মন্দ বলতে তো পারি, কিন্তু চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি না। ভাল বা মন্দ বলার অর্থ এই হয় যে, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সে কাজ করছে বা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

কখনও কখনও ভাল বা মন্দ আপেক্ষিক রূপ ধারণ করে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তির গুলি লাগলো তখন যে তার বন্ধুভাবাপন্ন হবে সে বলবে যে, খারাপ কাজ হয়েছে। কিন্তু বিরোধী হলে সে বলবে যে, ভাল কাজ হয়েছে। ইহাই হলো ভাল বা মন্দের আপেক্ষিক রূপ। আমরা ইহাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি না। ইহা স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ বটে যা কিনা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হচ্ছে। ইচ্ছার যেহেতু সংমিশ্রণ নেই এজন্যে উহাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বলি না। কিন্তু কাজ এক রকমেরই।

অবশ্য যখন উন্নতি করতে করতে মূল পদার্থ মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করে তখন এই ৬টি বৈশিষ্ট্য শ' শ' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। যেহেতু মূল পদার্থকে পর্যায়ক্রমে মিশ্রণের পরে মানব সৃষ্ট হয়েছে এসব বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মিশ্রিত হতে থেকেছে। রং হলো এর দৃষ্টান্ত। ইহা আসলে তো কেবল ৬/৭ প্রকারের কিন্তু ইহাকে মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় শত শত রং তৈরী করে নেয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশ নব নব রূপে হতে থাকে– ইহাকে 'খুল্‌ক' (প্রকৃতি, গুণ বা স্বভাব) বলা হয়। যেন উহা একটি নতুন সৃষ্টি। আর 'খালক' অর্থাৎ দৈহিক সৃষ্টি থেকে পার্থক্য করার জন্যে পেশ ব্যবহার করে 'খুলক' হিসেবে বলা হয়। নচেৎ আসলে উহাতে ৬টি বৈশিষ্ট্যই নিহিত যা প্রাথমিক কাল থেকে মূল বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত উহা জড় পদার্থে ক্রিয়াশীল থাকে উহাকে বলা হয় শক্তি। যখন বৃক্ষ-লতাদিতে একটু অপেক্ষাকৃত পূর্ণাকারে বিকশিত হয় তখন উহাকে বলা হয় অনুভূতি। যখন জীব-জন্তুর মধ্যে তাথেকে পূর্ণাকারে বিকাশ লাভ করে তখন উহাকে কাম-প্রবৃত্তি বা প্রাকৃতিক চাহিদা বলা হয়। এবং যখন এথেকেও পরিপূর্ণ আকারে মানবের মধ্যে বিকশিত হয় তখন চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে উহার বিকাশকে প্রাকৃতিক চাহিদা বা প্রাকৃতিক বিকাশ বলা হয়। আর যখন চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে উহার বিকাশ ঘটে তখন উহাকে 'খুলক' বলে অর্থাৎ বলা হয় উন্নতির চরম মার্গে পৌঁছে গেছে। যেভাবে কুরআন করীমে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে এসেছে ঃ

'আর আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাষ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি শুক্র-বিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানে। অতঃপর সেই শুক্র-বিন্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্ত-পিন্ডে পরিণত করলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্ত-পিন্ডকে (আকৃতি বিহীন) মাংস-পিন্ডে পরিণত করলাম। অতঃপর সেই মাংস-পিন্ডকে অস্তিপুঞ্জে পরিণত করলাম। এর পরে সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করলাম, তারপরে উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করলাম। সুতরাং অতিশয় কল্যাণময় সেই আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী (সূরাতুল মু'মিনূন ঃ ১৩-১৫)। মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলা সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত করলেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে তার অধীনস্থ করে দিলেন। (চলবে)

অনুবাদ – **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন এর ১৯তম সালানা জলসা-২০০০ অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী , ২০০০ইং তারিখে রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিনব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন-এর ১৯তম সালানা জলসা তথা শহিদী জলসা-২০০০ অত্র জামাত এর মসজিদ বাইতুস সালাম প্রাঙ্গণে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনা মসজিদে গত ০৮/১০/৯৯ তারিখ বোমা হামলায় শহীদ ভাইদের স্মরণ করা হয়। এ জলসায় আহত জনাব এনামুল হক (রনী) ও জনাব শেখ মোহাইমেন (চঞ্চল) এর লিখিত শহীদ ভাইদের স্মৃতি জড়ানো কবিতা পাঠ করে শোনান হয়। উক্ত জলসাতে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি জনাব মাওলানা রাজা নাসের আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় কেন্দ্রের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি ও প্রাক্তন আমীর, ঢাকা জামাত, জনাব মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী, জনাব ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম খান, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ, জনাব এস এম আব্দুল আজিজ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ, জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী অডিও ভিডিও ও জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, ন্যাশনাল সেক্রেটারী যায়েদাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় আমীর জনাব জিএম মতিয়ার রহমান সাহেব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন অত্র জামাতের সেক্রেটারী তবলীগ জনাব শেখ জোনাব আলী সাহেব। জলসা গাহে মহিলাদের দেখার ব্যবস্থা না থাকায় সরাসরি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে ১০টি বাড়ীতে মহিলারা জলসা দেখেন। এ জলসাতে প্রায় ২০০০ পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মাহফুজুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ- এর বিশেষ জ্ঞাতব্য

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর সকল রিজিওনাল / জেলা নাযেম, যয়ীমে আলা যয়ীমদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত বছর (১৯৯৯ সনে) অনুষ্ঠিত ২২তম মজলিসে শূরায় গৃহীত সাধারণ প্রস্তাবাবলী এবং ২০০০ সালের প্রস্তাবিত বাজেট হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সদয় অনুমোদন দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সদর সাহেবের নিকট প্রেরিতপত্রে হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ্র সকল সদস্যকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শূরার প্রস্তাবনা মোতাবেক বাংলাদেশে আনসারুল্লাহ্র বড় বড় মজলিসগুলিতে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে নিম্নবর্ণিত পদগুলি পূরণের জন্য নাম প্রস্তাব করে অনুমোদনের জন্য সদর সাহেবের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

১। এডিশনাল মুন্তাযেম নও মুবায়েইন
২। এডিশনাল মুন্তাযেম ওয়াকফে নও
৩। এডিশনাল মুন্তাযেম রিশ্তানাতা

আনসারুল্লাহ্র কার্যক্রমে সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও খাস দোয় কামনা করি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
কায়েদ উমুমী ও
সেক্রেটারী শূরা

পাক্ষিক আহমদী
১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক
আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র

The Fortnightly AHMADI
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
Telephone : 9662703 Fax : 880-2-8613414

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ /. না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'বার্তা সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪ 'News Editor, **Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Fax : 880-2-8613414 Bangladesh এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ .....

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘর ঃ ..... (পোষ্ট কোড নং) .....

জেলা ঃ .....

** বহির্দেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালী কর্তৃক মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ সাদেক (দূর্গারামপুরী) এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও পাশের ছবিতে স্থানীয় জামাতের সদস্য বর্গ

কুকুয়া জলসা শেষে পীরজাদা আবুল কালামের সাথে আলোচনা করছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

বেতাগী থানার কাউনিয়া গ্রামে তবলীগি জলসায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় তবলীগ টিমের আহবায়ক মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

কাউনিয়ায় মাষ্টার ওহাব ও কেন্দ্রীয় তবলীগ টিমের আহবায়ক মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সাথে স্থানীয় আহমদী সদস্যরা

খাকদান মসজিদের সামনে : নিচে বসা সর্বজনাব দেলোয়ার হোসেন দিলীপ মাষ্টার জালাল আহমদ ও তসলিম আহমদ এবং মাঝে অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

New Vol. No. 62 ❑ 19th Issue April 15, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

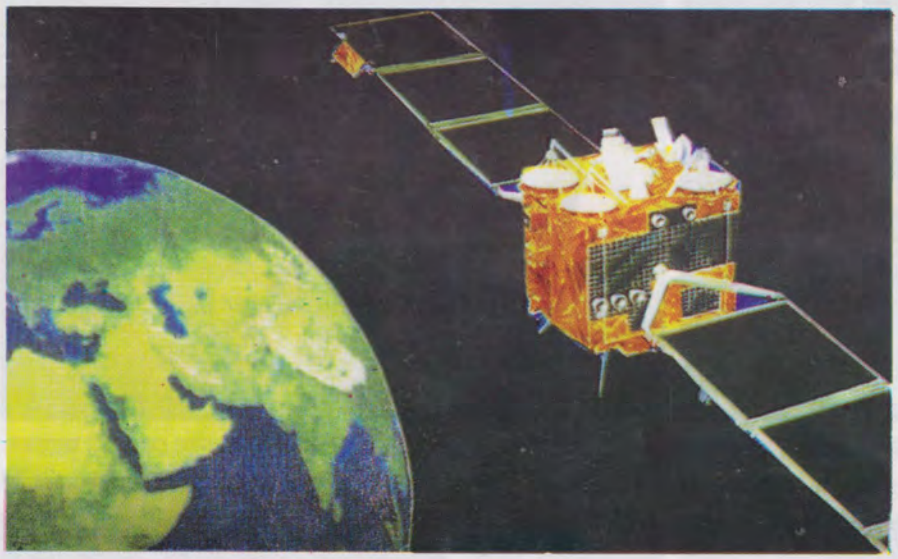

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক বুধবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272